পৃথিবী।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছোনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং॥
ঋগ্বেদঃ। ১০। ১১। ৩।

দীপ-নির্ব্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন ১২৮৯।

উপহার।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃদেব শ্রীচরণকমলেষু।

খেলিতে খেলিতে ক্ষুদ্র শিশুটি যেমন
পেয়ে কোথা কাঁচ ভাঙ্গা, মাটী বা উপল রাঙ্গা,
কি জানি কি মহামূল্য ভাবিয়ে রতন,
মনের আগ্রহে ছুটি, বার বার পড়ি উঠি,
সঁপে আসি' মার করে সে অমূল্য ধন।

বিজ্ঞান জগত মাঝে স্খলিত চরণ,
ক্ষীণ হস্ত বাড়াইয়ে কি পাইনু কুড়াইয়ে,
দেখ দেব একবার মেলিয়ে নয়ন।
মা আমার নাই আর, ছুটে যাব কাছে যাঁর,
জনক-জননী দেব তুমিই আমার।
পূজিতে চরণ তব আজিকে আগ্রহে নব
এসেছি পিতা গো নিয়ে এই উপহার!

সংশোধন-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	১১	নৈায়ায়িকেরা	নৈয়ায়িকেরা
৩	১৭	এই	ঐ
৬	১৬	সূর্য্য	(উঠিয়া যাইবে)
ঐ	ঐ	যে স্থান	যে যে স্থান
৭	১৭(টীকা)	জ্যোতির্বেত্তারও	জ্যোতির্বেত্তার
৯	১৩	স্থল	স্থূল
১০	১৮	গতি	গতি শক্তি
১২	১৯	জ্যোতিষিক	জ্যৌতিষিক
ঐ	২১	স্যচতে"	স্যচ্যতে।"
১৫	৮	ভন্ন	ভিন্ন
ঐ	১৭	সম্পূর্ণ	পৃথিবী সম্পূর্ণ
২১	৩	সর্ব্বত্রই	প্রচলিত
২৩	১৪	দ্বীপ	দীপ
ঐ	ঐ	তেছে	তেছে।
ঐ	ঐ	এই	এই,—
২৫	১(টীকা)	আকাশে	সমসূত্র, আকাশে
৪৬	১	বেঁকিয়া বেঁকিয়া	বাঁকিয়া বাঁকিয়া
ঐ	১১	একবার	পৃথিবী একবার
ঐ	১৩	৫০-২২	৫০ ডিগ্রী ২২

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	৬	৫০.২২	৫০ ডিগ্রী ২২
৫১	১৩	৬১-৯	৬১ ডিগ্রী ৯
৫৮	১৭	কটীদেশ	কটিদেশ
৬৬	১০	কোটিদেশ	কটিদেশ
ঐ	১৫	পৃথিবীর গোলক	পৃথিবী-গোলক
৬৭	২২	১০০	১৫০
৭৫	৪	আসান সোল	আসান শোল
৯৩	২১	উষ্ণ	উষ্ণ
১১৮	৩(টীকা)	অ্যামেকার	জ্যামেকার
১২৭	৭	শ্যাকজার	শ্যাকসার
ঐ	১৮	সুকিসার	শ্যাকসার
১২৮	১	কাঁপর	কাঁপে
১৩১	২(টীকা)	Megalonyse	Megalonyx
১৩৯	১৪	সমূহ	স্তর সমূহ
১৬৩	১৩	গত বৎসর	১৮৮০ খৃঃ অব্দে
১৬৬	৩	গত বৎসর	১৮৮০ খৃঃ অব্দে

পৃথিবী।

ভূমিকা।

গণিত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন; নানা কারণবশতঃ অঙ্ক-শিক্ষাও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না,—বিজ্ঞান এইরূপ কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা বিশ্ববিদ্যালয়েই একরূপ আবদ্ধ। বিজ্ঞানের এই দুরূহ পথ সুগম করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকা দেশে গণিতের সাহায্য ব্যতীত যেরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচার হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই প্রকার গ্রন্থের আদর্শানুসারে রচিত।

পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের মনে প্রধানতঃ যে সকল প্রশ্ন উদিত হইতে পারে, তাহারি মীমাংসা-স্বরূপ, প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ-অনুযায়ী সাধারণের পাঠোপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ, গত দুই বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় ও ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

প্রধানতঃ নর্ম্মাণ লকিয়ার, গডফ্রে, নিউকাম ব্যালফোর-ষ্টুয়ার্ট ও ফিগুয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত, অপরাপর যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহা যথা স্থানে স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রধান অসু-বিধা পারিভাষিক শব্দের অভাব। এ পুস্তকে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ প্রায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে—তবে দু একটি প্রচলিত শব্দের স্থানে অন্য শব্দও ব্যবহৃত হই-য়াছে। সচরাচর অগ্ন্যুৎগারী পর্ব্বত সকলকে আগ্নেয় গিরি বলিয়া উল্লিখিত হয় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের জ্বালামুখী শব্দে যখন ঐ অর্থটি আরো সুস্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও বা বঙ্গভাষায় চলিবে না কেন? ঐ উৎকৃষ্ট কথাটি বঙ্গ-ভাষায় প্রবেশার্থী করিয়া এ পুস্তকে ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছি। * যে যে স্থানে পারিভাষিক শব্দের অপ্র-তুল হইয়াছে সেই সেই স্থানে নূতন শব্দ রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সকল নূতন রচিত কথা গুলিই যে গৃহীত হইবে তাহা প্রত্যাশা করি না। জীব জগতেও যেমন শব্দ জগতেও তেমনি—যাহা যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে। যদি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ গুলি, সকল ভাষায় একই রাখা যায়—তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভাষার

* বোধ হয় এ কথাটি ব্যবহার করা অসঙ্গত হয় নাই, আশ্বিন মাসের ভারতীতে পৃথিবীর পরিণাম শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথম ইহা ব্যবহার করা হয়। তাহার পর মাসে দেখিলাম চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহও ঐ অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন।

উন্নতি হয় দেখিয়া যে স্থানে মনোমত প্রতি-শব্দ না পাওয়া গিয়াছে সে স্থানে ইংরাজি মূল শব্দই রাখা হইয়াছে।

সচরাচর ইংরাজি জ্যোতিষিক পাঠ্য পুস্তকে বাস্তবিক পৃথিবী সচল এবং সূর্য্য স্থির বলিয়া দিয়া তাহার পর পৃথিবীকে স্থির অনুমান করিয়া, সূর্য্যের দৃশ্যতঃ গতি আলোচিত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর গতিবিধি যথার্থরূপ বুঝিবার পক্ষে ধাঁধা লাগিতে পারে, সে জন্য এখানে পৃথিবীর বাস্তব গতি অবলম্বন করিয়াই অপর সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অঙ্ক বিদ্যার সাহায্য ছাড়িয়া কোন ইংরাজি গ্রন্থে ক্রান্তিপাতের গতি বুঝান হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাই নাই এ পুস্তকে সে বিষয়ে যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা।

ডেরাডুনের ভারতবর্ষীয় সরবে অফিসের সুযোগ্য গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায়ের প্রুফ সংশোধন করিয়া যে সাহায্য করিয়াছেন সে নিমিত্ত এইস্থলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপক্রমণিকাতে আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিক উন্নতি সম্বন্ধে যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশ শ্লোকই আমাদিগের অনুরোধে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহা-

শয় অনুসন্ধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই পরিশ্রমের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপকৃত রহিলাম।

অগ্রে মূল গ্রন্থখানি পড়িয়া পরে উপক্রমণিকাটি পড়িলে ভাল হয়, কারণ মূল গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উপক্রমণিকাটি এমন বিশেষ রূপে জড়িত যে অগ্রে উপক্রমণিকা পড়িলে তাহার স্থানের স্থানের যথার্থ অর্থ সহজে বোধগম্য না হইতে পারে।

উপক্রমণিকা।

বিজ্ঞান শিক্ষা।

জীবনের প্রভাত কালে, চৌদিক-সজ্জিত প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি, পরে দেখিতে দেখিতে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ-স্পৃহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যের প্রভাবও মন্দ হইয়া পড়ে। তখন আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি না, বিস্ময়-উদ্দীপক বস্তুকে কেবল মাত্র দেখিয়াই আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না, আশ্চর্য্য প্রভৃতি মনোভাবের দ্বারা আমরা প্রথমে যে সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই বস্তু সমুদ্রের উপকূলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি, মনোভাব শমিত হইলে আমরা সেই সকল বস্তুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হই। মনুষ্যের এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বস্তুদিগের প্রাকৃতিক তত্ত্ব নির্ব্বাচন করাই বিজ্ঞানের কার্য্য।

ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি, বেদবর্ণিত সময়েও ভারতবর্ষে আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চা দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষীয়গণ যে অঙ্ক-বিদ্যার প্রবর্ত্তক তাহা সর্ব্ব-

বাদী সম্মত। ১।২ প্রভৃতি অঙ্ক আরবেরা এ দেশ হইতে শিখিয়া ইয়োরোপে প্রচার করে। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ বীজগণিত জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ইয়োরোপে তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিলেই হয়। চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যাতেও ভারতবর্ষীয়গণ জগতের গুরু। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ আরবেরা নিজভাষায় অনুবাদ করিয়াছে এবং গ্রীকগণও ইহা এদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। ভৌতিক বিদ্যাতেও আর্য্যেরা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ন্যায়দর্শনে শব্দ উৎপত্তির তত্ত্ব বিশদরূপে সন্নিবেশিত আছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন যেমন কোন জলাশয়ে কোন গুরু বস্তু নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ তাহাতে বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, শব্দও সেইরূপে উৎপন্ন। কিন্তু জলের তরঙ্গমালা একই দিকে অগ্রসর হইতে থাকে শব্দ সেরূপ নহে। যেমন কদম্ব পুষ্পের চারিদিকে সমান কেশর, শব্দও সেইরূপ সমান ভাবে বীচি তরঙ্গের আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। ইহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভিমত।

জ্যোতির্ব্বিদ্যাও হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথমে আলোচিত। খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্যোতিষ আলোচনা দেখা যায়। যদিও আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস নাই তথাপি অন্য সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে—

এবং ইয়োরপীয় পণ্ডিতগণের যত্নে ও অনুসন্ধানে এই সমুদায় এখন অতি সহজেই জানা যাইতেছে।

৭০০০ বৎসর কাল মাত্র আমরা মনুষ্য-জন্মের নিশ্চিত প্রমাণ পাই। ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যদি ভারতে জ্যোতিষের ন্যায় কঠিন বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়া থাকে তবে না জানি মনুষ্য জীবনের কত শৈশবেই ভারতবর্ষীয়গণ সভ্যতার সোপানে উঠিয়াছিলেন। এদেশ হইতেই জ্যোতিস ক্রমে ক্যালডিয়া মিশর গ্রীস প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে ইয়োরপে ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—

"ভূপঞ্জরঃ স্থিরোভূরে বাবৃত্ত্যা বৃত্ত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।"
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাং॥

"পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতঃই স্থির নক্ষত্র মণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।"

পৃথিবীর সমস্ত গতিই তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এমন কি ক্রান্তিপাতের বক্রগতি (Precession of the Equinoxes) যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত তাহা ইয়োরপে নিরূপিত হইবার বহু দিন পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন। *

---

* ইহার প্রমাণ দেখিবার জন্য আমাদের দূরে যাইতে হয় না। সামান্য একখানি পঞ্জিকাতে পর্য্যন্ত আর্য্যভট্টের এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। অয়নাংশ প্রকরণে দেখা

দূরবীন সৃষ্টি হইবার পর ইয়োরপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্য বিম্ব (Solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে।

"তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।

তেনাস্মিন শ্যামিকা জাতা শাতনোর্চিষ স্তথা।"

"বিশ্বকর্ম্মা, অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।"

তাঁহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতায় সূর্য্য-বিম্বের, অর্থাৎ সৌরকলঙ্কের কথা আরো স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল সূর্য্য-বিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান বরাহ মিহির বহুদিন পূর্ব্বে তাহাই বলিতেছেন—

"যস্মিন যস্মিন্দেশে দর্শনমায়াস্তি সূর্য্য বিম্বস্যাঃ।

যায়—"রাশিচক্র পৃথিবীর মধ্যে রেখা যে স্থলে সমসূত্রপাতে মিলন হয় সেই স্থলকে ক্রান্তিপাত কহে, সেই ক্রান্তিপাত স্থলে উত্তর দক্ষিণে এক রেখা কল্পনা করিয়া ঐ রেখাকে বিষুবরেখা কহে, সেই বিষুবরেখা ক্রমে পশ্চিম দিকে গমন করতঃ রাশিচক্রের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে—ইহা আর্য্যভট্ট কহেন" ইত্যাদি।

তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীপতীনাং পরিজ্ঞেয়ং। * *
* * * * বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ
সরিতো আয়াস্তি তনুত্বং ক্বচিৎকচি জ্বায়তে শস্যং।"

"যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায় সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। * * *
মেঘ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থানে মাত্র শস্য জন্মায়।"

জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল স্বরূপ যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন সেই নিয়মের সুস্পষ্ট জ্ঞান পুরাকালে ছিল বলিয়া যদিও আমরা প্রমাণ পাই না, কিন্তু ইহার আংশিক জ্ঞান বহু কাল পূর্ব্বে যে সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিউটনের অনূ্যন আটশত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন

"বৃতা ধৃতা ধরা কেন যেন নেয়মিয়াদধঃ"—

এই যে পৃথিবী কিসের দ্বারা ধৃত, আর কেনই বা অধঃপতিত হয় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।

"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পতিতীব ভাতি,
সমে সমন্তাৎ কুরিয়ং যতঃ খে।"

এই পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিমতী, সেই আকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকাশস্থ গুরু-ভারি বস্তু সকলকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা পড়িতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। যেহেতু এই পৃথিবী আকাশে অবস্থিত, এবং ইহার চারিদিকে সমান আকাশ, সেই হেতু ইহার অধঃউর্দ্ধ নাই, তবে ইনি কোথায় পড়িবেন ?"

আর একস্থানে লিখিতেছেন

"নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈববিয়তি
নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ-
মনুজা দিত্য দৈত্যং সমস্তাৎ।"

এই পৃথিবীর অন্য কোন আধার নাই, ইনি আপনার আকর্ষণ শক্তিতেই আপনি আকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহারি সেই আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে দৈত্যদানব ও মানবাদি সমস্তই ইহার পৃষ্ঠে স্থিতি করিতেছে।

সূর্য্যের আকর্ষণ সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে ছাড়া প্রাচীন ঋগ্বেদেও দেখা যায়

"আকৃষ্টেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং।
হিরন্ময়েন রথেন সবিতা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।"

"আকর্ষণ শক্তিযুক্ত সর্ব্ব-পরিচালক রজোগুণ যাহার বর্ত্তমান আছে, সেই সূর্য্যদেব অমরলোক সকলকে সন্নিবিষ্ট

রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময় রথের দ্বারা ভুবন সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন।”

এই একটি ঋকের মধ্যে সূর্য্য সম্পর্কীয় নবাবিষ্কৃত অনেকগুলি সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

অণু অণুকে আকর্ষণ করে মাধ্যাকর্ষণের এই যে একটি নিয়ম প্রাচীন গ্রন্থে ইহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

জৈন দর্শনে রহিয়াছে

“অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যতে। তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্ট শক্তিরেবাদ্য সংযোগে কারণ ভাবমাপদ্যতে।”

“অণুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বি-অণু ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এস্থলে অণুদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট শক্তিই আদ্যসংযোগে কারণতা প্রাপ্ত হয়।”

ইহার দ্বারা প্রত্যেক পরমাণুরই আকর্ষণ শক্তি বলা হইতেছে। আকর্ষণ শক্তি যে তখন জানা ছিল তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার জন্যই নিউটনের খ্যাতি নহে, তাঁহার পূর্ব্বেতেই হাইগেন্স প্রথমে কেন্দ্রাকর্ষণ শক্তি বাহির করিয়াছিলেন।

একটি আকর্ষণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে বিশ্বচরাচর চালিত হইতেছে ইহাই নিউটন আমাদের প্রথমে শিক্ষা দেন এবং সেই জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। মাধ্যাকর্ষণের এই সুস্পষ্ট জ্ঞানটি আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাচীন কোন

গ্রন্থে দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহা হইতেই যে আমরা নিষ্পত্তি করিতে পারি তাঁহারা মাধ্যাকর্ষণ জানিতেন না, তাহাও নহে। ভারতবর্ষে যে কত দূর বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল আমরা তাহার সবিশেষ কিছুই জানি না, ভারতবর্ষ প্রকৃত ইতিহাসশূন্য. ভারতবর্ষের পুস্তক প্রভৃতি স্থায়ী কীর্ত্তিসমূহও প্রায় বিলুপ্ত, এই অবস্থায় প্রচলিত শ্রুতি পরম্পরায় পৌরাণিক উপাখ্যানে, ও লুপ্তাবশেষ পুস্তকে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে সেই প্রাচীন উন্নতির ছায়া মাত্র প্রকাশ পায়।

পৌরাণিক উপাখ্যানে রূপক রূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

এই যে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর জীবনইতিহাসে চারিটি যুগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন পৌরাণিক আখ্যানে তাহারি কি পরিচয় পাওয়া যায় না? পুরাতত্ত্ব অধ্যায়ী মাত্রেই জানেন, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে দুই প্রকারে সত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরা শিষ্যদিগকে নিগূঢ় সত্য শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সেই সকল কঠিন সত্য সর্ব্ব সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইবে বুঝিয়া তাহাই সাধারণের জন্য রূপকরূপে প্রচারিত হইত; যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব সেই জন্য অতি অল্পলোকেই জানিত। সুতরাং ক্রমে যখন জাতীয় অবনতি আরম্ভ হইল, কঠিন জ্ঞানাভ্যাস হইতে সকলে বিরক্ত হইতে লাগিল, তখন অল্পলোকনিবদ্ধ সত্য সকলও

সেই লোকদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লোপ পাইয়া আসিল, সাধারণপ্রচলিত রূপক মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

পুরাণানুসারে জীবশূন্য অপার জলধিজলের প্রথম-জীব মৎস্য, দ্বিতীয় জীব কূর্ম্ম, তৃতীয় জীব বরাহ, চতুর্থ নৃসিংহ। রূপক করিয়া তাঁহারা বিধাতাকে বার বার এই রূপে অবতার করাইয়াছেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হইল, সুতরাং স্বয়ং তিনি যেন এক এক বার এক এক জাতীয় জীবরূপে অবতার হইলেন। বুঝিয়া দেখিলে এই রূপকেই কি আধুনিক বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্য পাওয়া যায় না? ইয়োরোপীয় ভূবেত্তাগণ পৃথিবীর ইতিহাসকে যে চারিযুগে ভাগ করেন তাহার পর্য্যায় কি?

প্রথম, মৎস্য যুগ, Age of Fishes.

দ্বিতীয়, সরীসৃপ যুগ, Age of Reptiles.

তৃতীয়, স্তন্যপায়ী যুগ, Age of Mammals.

চতুর্থ, মনুষ্য যুগ, Age of Men.

প্রথমযুগে পৃথিবীতে মৎস্যই শ্রেষ্ঠ জীব ছিল, ইয়োরোপীয় ভূবেত্তাগণ সেই জন্য তাহার নাম মৎস্য যুগ রাখিয়াছেন, পৌরাণিক উপাখ্যান রূপক সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুকে এই যুগে মৎস্য রূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাহার পর দ্বিতীয় যুগের প্রধান জীব সরীসৃপ, তখনকার সরীসৃপ অতি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতায়তনের। পুরাণে সেই জন্য এক কিম্ভূত কিমাকার প্রকাণ্ড শরীরী কচ্ছপকে দ্বিতীয়

যুগে অবতারণা করা হইয়াছে। পুরাণের কূর্ম্ম যেরূপ অদ্ভুতাকার ও প্রকাণ্ড শরীরী, তাহাতে ইয়োরোপের দ্বিতীয় যুগ-স্তর-প্রাপ্ত ম্যাগালিসোরস্ ইকথিয়সোরস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরীসৃপদিগের আর এক জাতি আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই। তাহার পর ইয়োরোপীয় ভূবেত্তাদিগের মতে তৃতীয় যুগে স্থূলচর্ম্মী স্তন্যপায়ী হস্তী মহিষ বরাহ ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তুই প্রধান, সুতরাং তৃতীয় যুগে বরাহ অবতার বলিলে তাহা কিছুই অসম্ভব বলা হয় না। হয় ত তৃতীয় যুগে ভারতবর্ষে বরাহেরই প্রাধান্য ছিল—ইহারা তখন যেমন সংখ্যায় অধিক তেমনি আকারে প্রকাণ্ড হইত। সর্ব্বশেষে মনুষ্য যুগ, মনুষ্য প্রথম জন্মকালে এখনকার মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিতে ছিল এজন্য পরশুরামরূপী মানুষের পূর্ব্বে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ হইয়াছে।

এইরূপে পৌরাণিক আখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে, অনেক লুক্কায়িত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।

প্রাচীন বিজ্ঞান-শাস্ত্র ধারাবাহীরূপে ভারতবর্ষে কি অন্য কোথাও চলিয়া আসে নাই। মাঝে মাঝে অসভ্য জাতির উপদ্রবে, দেশীয়দিগের অবহেলায়, কালের স্মৃতি-লোপী অন্ধকারে প্রাচীন বিজ্ঞান একরূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকালের পর ষোড়শ শতাব্দীতে আবার তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। নূতনাবিষ্কৃত প্রণালী ক্রমে

বর্ত্তমান বিজ্ঞান পূর্ব্বজানীত সত্য পুনরাবিষ্কার করিয়া একটি নূতন যুগের আরম্ভ করিল।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ইয়োরোপে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে গ্রীকগণই ইয়োরোপে বিজ্ঞানকে তাঁহাদের একাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আরিষ্টটল ইয়োরোপের সেই প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ। ইনি চিন্তাজগতের একজন স্বেচ্ছাচারী রাজা। ইনি যে সকল স্বকপোলকল্পিত মত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন, পরবর্ত্তী সময়ে কেহ তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিলে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত। আরিষ্টটল পৃথিবীকে অচল ও সূর্য্যকে সচল বলিয়াছেন বাইবেলেরও ঐ মত সে জন্য খৃষ্টানধর্ম্ম-যাজকেরা আরিষ্টটলের কথাই সত্য বলিয়া মানিতেন; তাঁহারাও সেই জন্য স্বাধীন চিন্তার পথে তখন কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। জর্ম্মাণ দেশীয় রোমানক্যাথলিক পুরোহিত বৈজ্ঞানিক শিনার একজন আরিষ্টটল ভক্ত ধর্ম্ম-যাজককে সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিয়াছেন বলায় সে ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে বলিল "তাহা কখনই হইতে পারে না, কেন না আরিষ্টটল এমন কথা বলিয়া যান নাই, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সূর্য্যের কলঙ্ক নহে, তোমার চক্ষের"। গ্রীকদিগের বহুকাল অধিকৃত বৈজ্ঞানিক সিংহাসন ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিরা অধিকার করিয়া লইলেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোপর্ণিকস এই শতাব্দীতে পৃথিবীর সূর্য্য পরিভ্রমণ

ও কেপলার গ্রহগণের গতির মূল নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইয়োরোপের মুখোজ্জ্বল করিলেন; এই শতাব্দীতেই ইতালীয় পণ্ডিত গেলিলিও গতির কয়েকটি নিয়ম বাহির করিয়া আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিলেন, এবং ইংলণ্ডে গিলবর্ট কর্তৃক তাড়িত ও চৌম্বক তেজ আবিষ্কৃত হইল। তাহার পর এই শতাব্দীর শেষে বেকন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার প্রণালী সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিলেন। তাহার পর হইতে ক্রমে অপ্রতিহত প্রভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন লুপ্ত বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম যুদ্ধের কাল, দ্বিতীয় জয়। যুদ্ধ যুগের নেতা কোপর্নিকস কেপলার ও গেলিলিও। ইহাঁরা গুরু-বাক্য অনুযায়ী পূর্ব্বকল্পিত মতকে অকাট্য ভাবিয়া তাহার অনুযায়ী করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে দাঁড় করাইতে যাইতেন না, ইহাঁরা অগ্রে ঘটনা দেখিয়া তাহার অনুযায়ী কারণ নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইতেন, এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার উপর আপন আপন মত নির্ম্মাণ করিতেন। ইহাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালী, আরোহণ—Induction.

বিজ্ঞান সমাজে অবরোহ (Deduction) প্রণালীর কার্য্য

অন্ত প্রকার। এই প্রণালী দুইটীর ব্যাখ্যা করা যদিও এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু পুস্তক মধ্যে দুএক স্থানে যখন আরোহী ও অবরোহী প্রণালী অনুসারে দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে তখন তাহাদের পরিচয় সম্বন্ধে এখানে দুএকটি কথা বলাও নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং প্রণালী দুইটির কূট নিয়মাবলী পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের স্থূল মর্ম্মটুক সংক্ষেপে এইখানে বলা যাইতেছে।

অগ্রে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া পরে যে প্রণালী দ্বারা সেই বিশেষ বিশেষ ঘটনাব্যাপী একটি সাধারণ মূল সত্যে উপনীত হই, বা কতকগুলি বিদিত সত্য লইয়া যে প্রণালী ক্রমে সেই বিদিত সত্যব্যাপী একটি অবিদিত সত্যে আসি তাহাকেই আরোহী প্রণালী কহে। যথা, একটি অবস্থায় অগ্নি সংযোগে লৌহ লোহিত বর্ণধারণ করে ইহা একটি সাধারণ মূলসত্য; আরোহী প্রণালী ক্রমে আমরা এই সত্যে উপনীত হই। আমি আমার হস্তস্থিত একটি লৌহশলাকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দেখিলাম একটি অবস্থায় তাহা লাল হইল, তোমার হস্তস্থিত লৌহ শলাকায় অগ্নিসংযোগ করিয়াও তাহাই হইল, এইরূপ বহু সংখ্যক লৌহ শলাকাকে একই রূপ অবস্থায় অগ্নিতে লাল হইতে দেখিয়া, আমি এই কতকগুলি বিশেষ ঘটনা হইতে শেষে এই মূল সত্যে আসিলাম—যে একটি বিশেষ অবস্থায় লৌহ শলাকা মাত্রেই অগ্নি সংযোগে লাল হয়। পূর্ব্বোক্ত বিশেষ সত্য-

গুলি *এই মূল সত্য দ্বারাই ব্যাপ্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তটি দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, জগতে যে কোন স্থানে হউক না অনন্তের যে কোন অংশে হউক না, অবস্থা সমান থাকিলে এ সত্য সত্যই থাকিবে। অথচ আমাদের দ্বারা কিছু ইহা সর্ব্বস্থানে বা সর্ব্বকালে পরীক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং লৌহ শলাকা মাত্রেই যে একটি অবস্থায় অগ্নি-সংযোগে লাল হইবে—ইহা আমাদের নিকট অবিদিত, কিন্তু আমরা সহস্র স্থানে তাহার পরিচয় পাইয়াছি, কোথায় তাহার অন্যথা দেখি নাই, সেই জন্য এই বিশেষ ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়া অবিদিত এই সাধারণ মূল সিদ্ধান্তে আসিলাম যে লৌহ শলাকা মাত্রেই সমান অবস্থায় অগ্নি সংযোগে লাল হইবে। *

---

* এই স্থানে আর একটি কথা বলা উচিত। কতকগুলি স্থানে একইরূপ অবস্থায় একইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া তাহা হইতে একটি সিদ্ধান্তে আসিলেই যে সকল সময় আমরা একটি সত্যে আসিয়া পৌছিতে পারি তাহা নহে। মনে কর একজন ইংলণ্ডবাসী এদেশে আসিয়া যে একশত বঙ্গরমণীকে দেখিতে পাইলেন ঘটনাবশতঃ তাহারা সকলেই গৌরাঙ্গী; তাহা হইতে আরোহী প্রণালী অনুসারে ইংলণ্ড-বাসী যদি এই মীমাংসা করেন যে তবে বঙ্গরমণী মাত্রেই গৌরাঙ্গী তাহা হইলে কি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ঠিক হইবে? তাহা হইতে পারে না। আরোহী প্রণালী অনুসারে ঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে গেলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি পথ অতিক্রম

কোন একটি বিদিত মূল সত্যের অঙ্গ নির্ব্বাচন করিয়া যে প্রণালী দ্বারা তাহার অন্তর-নিহিত অবিদিত শাখা সত্যে আসিয়া পৌছান যায়, অথবা যাহা একই কথা, কোন একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত হইতে যে প্রণালী দ্বারা কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় সেই প্রণালীকেই অবরোহী (Deduction) বলা যাইতে পারে। যথা, আমরা এই একটি মূল সত্য জানি যে লৌহ শলাকা অগ্নিসংযোগে একটি বিশেষ অবস্থায় লোহিত বর্ণ ধারণ করে, আমার হাতে একটি লৌহ শলাকা রহিয়াছে ইহা শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ, আমি ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলাম না, অগ্নিতে ইহাকে লোহিত হইতে দেখিলাম না, তাহা না দেখিয়াই বলিতে পারি ইহা অগ্নি সংযোগে সেই অবস্থাতে লাল হইবে; কেন না আমি পূর্ব্ব হইতে জানি লৌহ শলাকা একটি অবস্থাতে অগ্নি সংযোগে লাল হয়, আমার হাতে যাহা রহিয়াছে ইহা একটি লৌহশ-লাকা সুতরাং আমার মনে হইল ইহাও সেই অবস্থাতে লাল

করিতে হয়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এ প্রবন্ধে সেগুলির উল্লেখ হইল না। তাহার মধ্যে প্রধান একটি এই, "আমি সহস্র স্থানে এইরূপ ঘটনা দেখিয়াছি কেবল তাহাই নহে তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আমার তাহা দেখিবার কিম্বা জানিবার সম্ভাবনা ছিল—সেই সম্ভাবনা সত্বেও যখন তাহার অন্যথা দেখি নাই তখন আমি যে সিদ্ধান্তে আসিলাম তাহা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।" এইরূপ একটি সম্ভাবনা আরোহী প্রণালীর যুক্তির মধ্যে থাকা চাই।

হইবে। এই বিশেষ শাখা সত্যটি পূর্ব্বোক্ত সাধারণ মূল সত্যের ভিতর নিহিত ছিল—এবং তাহারই অঙ্গচ্ছেদ করিয়া আমরা এই নূতন বিশেষ সত্যটি জানিতে পারিলাম, ইহার জন্য আর অন্যত্র যাইতে হইল না।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আরোহী প্রণালী যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া ক্ষান্ত হয় তাহাতেই অবরোহ প্রণালীর আরম্ভ।

আরোহী প্রণালী ক্রমে আমরা এই সাধারণ মূল সত্যে উপস্থিত হই যে অগ্নি সংযোগে লৌহ শলাকা লাল হয়। আরোহী প্রণালীর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অবরোহী প্রণালী আবার এই বিশেষ সিদ্ধান্তে আসে যে,

অগ্নিসংযোগে লৌহশলাকা লাল হয়,
আমার হাতে একটি লৌহশলাকা,
সুতরাং ইহাও অগ্নিসংযোগে লাল হইবে।

বিজ্ঞান এইরূপে একমাত্র আরোহী প্রণালী অনুসারে নূতন সত্যে উপনীত হয়, এবং অবরোহী প্রণালী অনুসারে একটি বিশেষ সত্য জানিতে পারিয়া আরোহী প্রণালীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকলের সত্যতা সপ্রমাণ করে। যেমন, আরোহী প্রণালী ক্রমে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম লৌহ অগ্নিতে লাল হয়, তাহা সত্য কি না দেখিবার জন্য আমার হাতেরটি অগ্নিতে দিলাম, লাল হইলে তখন অবরোহী প্রণালী ক্রমে আরোহী প্রণালীর সিদ্ধান্তটির সত্যতা প্রমাণ হইল।

আরোহী প্রণালী অনুসারে রীতিমত অনুসন্ধান দ্বারাই বিজ্ঞান জগতের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বের ভ্রমপূর্ণ মতগুলি দূর করিয়া যথার্থ সত্য শিখাইতে এই যোদ্ধাগণের যে কত সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এই অত্যাচার গেলিলিও পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হয়। তাঁহার পর হইতে ক্রমে বিজ্ঞান বিজয়ী হইল, সত্যের জয় শেষে পড়িয়াই রহিয়াছে। বেকন বিনা যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ব্বাচন প্রণালী লিপি-বদ্ধ করিলেন। বেকন এই প্রণালীর উদ্ভাবক বলিয়া কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রণালী বহু কাল হইতে প্রচলিত। বেকনের অল্পকাল পূর্ব্বে গিলবার্ট চৌম্বক তেজের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা এই প্রণা-লীর একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত স্থল। ১৫ শতাব্দীতে লিওনার্দো দাবিঞ্চি নামক বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর স্পষ্ট করিয়া এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—"কোন একটা বিষয় অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আমি সে বিষয় পরীক্ষা করি কেন না আমার অভিপ্রায় এই, যে প্রথমে পরীক্ষার দ্বারা পদার্থের ধর্ম্ম স্থির করিয়া পরে সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব অনুসন্ধান করা"। ইহা ছাড়া অনেক প্রাচীন দার্শনিক অতি বিশদরূপে এই প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। এক কথায় মনুষ্যের জন্মাবধি এই প্রণালীতে চিন্তা চালিত হইয়াছে তবে বেকনই প্রথমে ইহা যথাবিধি বিন্যস্ত-অবস্থায় লিপি বদ্ধ করিয়া, এবং ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একমাত্র প্রণালী

রূপে সিদ্ধান্ত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহার পর দেকার্ত্ত, হাইগেন্স ।নিউটন প্রভৃতি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকেরা ১৭ শতাব্দীকে কুসুমিত করিয়া তুলিলেন। এই রূপে বিজ্ঞান উত্তরোত্তর অবাধে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল।

বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে জ্যোতিষিক ও ভূবিজ্ঞানই এই পুস্তকের প্রধান আলোচ্য,সুতরাং সে সম্বন্ধেও এখানে বিশেষ দুএকটি কথা বলা আবশ্যক। বিজ্ঞান সমাজে জ্যোতিষিক বিজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। জ্যোতিষিক ঘটনা এখন সম্পূর্ণরূপে অঙ্কশাস্ত্রের আয়ত্তাধীন। জ্যোতিষীগণ গণনা দ্বারাই জ্যোতিষিক ভবিষ্যৎ ঘটনা নিশ্চিৎ রূপে জানিতে পারেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচিত বিষয় প্রধানতঃ দুইটি।

প্রথম, সূর্য্য ও গ্রহদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা,

দ্বিতীয়, গ্রহদিগের সূর্য্য প্রদক্ষিণের নিয়ম স্থির করা। গ্রীকদিগের মধ্যে সাধারণ প্রচলিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হইতে এখনকার বিশুদ্ধ মতে উপনীত হইতে পূর্ব্বোক্ত বিষয় দুইটি আবার দুইটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিয়াছে।

সূর্য্য ও গ্রহাদির পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের দুই সোপান,

প্রথম টলেমির মত। যে মত অনুসারে সৌর জগতের কেন্দ্র স্বরূপ স্থির পৃথিবীকে জ্যোতিষ্ক সকল প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কোপর্ণিকসের মত। সূর্য্য সৌর জগতের কেন্দ্র ও গ্রহগণ আপনার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাকেই প্রদক্ষিণ করে—ইহা কোপর্ণিকস প্রথমে নির্ণয় করেন।

গ্রহদিগের গতি সম্বন্ধে টলেমির মত অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া কেপলারের সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। কোপর্ণিকস যদিও সূর্য্য গ্রহাদির ভ্রমণ সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি গ্রহদিগের গতি বিষয়ে উল্লিখিত ভ্রমাত্মক মত ছাড়িতে পারেন নাই। কেপলারের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষীরা মনে করিতেন যে জ্যোতিষ্ক সকল সমগতিতে সম্পূর্ণরূপে বৃত্তাকার পথে শূন্যে বিচরণ করে। অসাধারণ পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার সহিত কেপলার প্রথমে এই ভ্রমাত্মক মতের অপনয়ন করিয়া গ্রহদিগের গতির নিয়ম সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন।

কেপলার গ্রহগণের গতি বিষয়ক-এই তিনটি মূল নিয়ম আবিষ্কার করেন।

১ ম নিয়ম। গ্রহ সকলের ভ্রমণ পথ (কক্ষ) সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হইয়া ডিম্বাকৃতি (বৃত্তাভাস) এবং এই বৃত্তাভাসের দুইটি অধিশ্রয়ের মধ্যে একটিতে সূর্য্য অবস্থিত।

সে জন্য সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে গ্রহদিগের সূর্য্য হইতে দূরত্ব সকল সময় সমান থাকে না।

২ য় নিয়ম। সূর্য্য হইতে গ্রহ যত দূরে যায় তাহার বেগের তত হ্রাস হয়, আবার ঘুরিয়া সূর্য্যের নিকটে আসিলে

তাহার বেগের বৃদ্ধি হয়। কক্ষের সর্ব্বাংশে গ্রহের গতি সমান বেগশালী নহে।

৩য় নিয়ম। যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যতদূরে অবস্থিত তাহার গতিবেগ তত মন্দ। *

ইহার পর নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া জ্যোতিষিক বিজ্ঞানের শিখরে উঠিবার পথ দেখাইয়া দিলেন।

ভূবিদ্যা অপেক্ষাকৃত আরো আধুনিক বিজ্ঞান। যদিও অনেক পূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর কঠিন আচ্ছাদন সম্পর্কীয় অনেক সত্য জানা ছিল, ভূবিদ্যার রীতিমত অনুশীলন হইবার বহু পূর্ব্বে অনেকে এই সকল জীবকঙ্কালের উৎপত্তির কারণ নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; এমন কি পীথাগোরাস পর্য্যন্ত প্রস্তরীভূত প্রাণীদেহাবশেষকে যদিও জীবকঙ্কাল বলিয়া গিয়াছেন তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮ শতাব্দীতেই ভূবিদ্যার জন্ম বলিতে হইবে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বুফোঁর পূর্ব্বে প্রাণীকঙ্কাল সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত দুইটি মত ছিল এক দল বলিতেন—ইহা চিত্রিত প্রস্তর মাত্র, ভূগর্ভ উত্থিত উষ্ণতার বিপ্লবে তরল প্রস্তরোপরি এইরূপ চিত্র

---

* কেপলারের নিয়মের ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। যে নিয়ম গুলি সহজে বোধগম্য হয় না, সেই জন্য উপরে তাহার স্থূল মর্ম্ম মাত্র উল্লিখিত হইল।

অঙ্কিত হইয়াছে। আর এক দল বলিতেন—প্রাণীদেহ উৎপাদক বীজ পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এইরূপ বিকৃত হইয়াছে। এই দুইটিই সাধারণ-প্রচলিত মত ছিল বটে কিন্তু ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে যথার্থ বৈজ্ঞানিক মতেরও প্রবর্ত্তন হইত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে স্মিথ নামে এক জন সামান্য ইংরাজ আমিন প্রথমে ভূবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। বিশেষ বিশেষ স্তরে বিশেষ বিশেষ জাতীয় প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া যায় ও স্তরপর্য্যায়ের সংস্থিতি যে সর্ব্বত্র সমান তাহা তিনিই প্রথমে দেখেন। এই দুইটি নিয়ম ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের মূলীভূত। এই মূল অবলম্বন করিয়া ভূবিদ্যা অবস্থান করিতেছে। ইহার উপর এখনকার ভূতত্ত্ববিদেরা নূতন ঘটনা সকল সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। সকল ঘটনাই ঐ দুই নিয়ম দ্বারা শাসিত হইতেছে।

ভূবিদ্যার মূল সিদ্ধান্ত—এই কয়েকটি।

১। অসীম সময় ধরিয়া পৃথিবী বিদ্যমান আছে।

২। এই বিপুল সময়ে জীবন্ত পদার্থের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যে একটি সাধারণ আকৃতি (Type) পাওয়া যায়, যাহা কালক্রমে নানারূপে পরিবর্ত্তনগ্রস্ত হইয়াছে।

এই সকল তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া ইয়োরোপে জীবতত্ত্ব বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই অল্পকালে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান যেরূপ

উন্নতি করিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে অনেক আশা করা যাইতে পারে কেননা যে পরিমাণ জীব দেহ পরীক্ষিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ পৃথিবীতে বিদ্যমান।

ইয়োরোপে এখন যেরূপ দ্রুতপদে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতেছে তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। ফরাসী পণ্ডিত রেনা ইহাতে বলেন, যে আর এক শতাব্দীর পর বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন বিদ্যারই মনুষ্যমণ্ডলীতে চর্চ্চা থাকিবে না। একশত বৎসর পরে কি হইবে বলা বড় দুঃসাধ্য, তবে মনুষ্যজাতির মধ্যে না হউক ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান ক্রমশই যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যবিস্তার করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল জ্ঞানগত উন্নতি ছাড়া বিজ্ঞান-প্রসাদে বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবহার-গত বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি হইতে পারে না, বিজ্ঞানের কার্য্য-গত শিক্ষার অভাবেই ইয়োরোপীয় জাতি হইতে আমরা অনেক বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহাতেই উন্নতি করিতে চাও বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হইবেই। যদি জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে চাও ত বিজ্ঞানের ধ্যান কর। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের চাবি স্বরূপ। যে রহস্য দ্বারা অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ হইতে পৃথিবীর কঠিন আচ্ছাদন

সৃজিত হইয়াছে, বিজ্ঞান সেই রাসায়ণিক রহস্য আমাদের নিকট খুলিয়া দেয়, যে সকল নিয়মে জগতের উপর জগৎ সুশৃঙ্খলা ক্রমে অনন্ত আকাশপথে ধাবিত হইতেছে বিজ্ঞান সেই সকল আমাদের দেখাইয়া দেয়। জ্যোতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা সৃষ্টির জন্মের সময় আমরা উপস্থিত থাকিতে পারি, বিনাশও কল্পনার চক্ষে আনিতে পারি।

বিজ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারাই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি দৃঢ়তা লাভ করে ও কল্পনাসম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি। এক কথায়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে যাহাকে আমরা কুসংস্কার বলি তাহার অপনয়ন হয়।

কেবল ইহাই নয়—যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের বৃদ্ধি করিতে হয় ত বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করিতে হইবে। বাষ্পীয় শকট বাষ্পীয়তরী প্রভৃতি মহাব্যাপার হইতে সামান্য দেশলাইটি পর্য্যন্ত সকলই বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফল। এইরূপে আমরা যেদিকে চাহিয়া দেখি বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব যতদিন না ভারতবর্ষীয়গণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিবে ততদিন আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান কণ্টক,বিজ্ঞানের ক্ষমতা-বলেই একমাত্র সে দারিদ্র্যের মোচন হইতে পারে। আমরা হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে

যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি দ্বারা দেশের আর এক নূতন রূপ দেখিতে পাইব। এদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে তখন আমাদের আর অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হইবে না, কি শিল্পে কি বাণিজ্যে সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্রধান হইতে পারিব। আজ কাল ইয়োরোপীয়গণ আমাদের এই রত্নগর্ভা ভারতভূমিতে আসিয়া আমাদের দেখাইয়া দেখাইয়া রত্নসকল লুঠিয়া লয়েন, আমরা যখন তাঁহাদের মত শিক্ষিত হইব, তখন আমাদের আর এরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। এখন অতীত কালেই আমাদের অহঙ্কার, স্মৃতিতেই আমাদের মাহাত্ম্য, বর্ত্তমানে আমাদের কিছু নাই, সুতরাং অতীত কথা নাড়াচাড়া করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। যেদিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন, সেই দিন অতীত ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমানের অহঙ্কার হইয়া দাঁড়াইব। সেই দিন সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে, ধনে মানে যশে আমরা অন্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব।

পৃথিবী।

সৌরপরিবারবর্ত্তী পৃথিবী।

"তারকা-কনক-কুচি, জ্বলদ-অক্ষর-রুচি
গীত লেখা নীলাম্বর-পাতে।"

নিঃস্তব্ধ নিশীথে অসংখ্য তারকা-মালা-খচিত অনন্ত নীল নভোমণ্ডল দেখিলে সকলেই রোমাঞ্চিত হয়—সকলের হৃদয়ই অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এমন অসাড়চেতা কেহই নাই যে তাহার মনশ্চক্ষু তারকাপূর্ণ আকাশে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তাক্ষর-লিখিত অনন্ত জীবনের অনন্ত কাব্য না পড়ে।

একটি মেঘশূন্য অন্ধকার রাত্রি জ্যোতিষ্কপূর্ণ আকাশ নিরীক্ষণ করিয়া অতিবাহিত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কতক গুলি জ্যোতিষ্ক সমান-দলবদ্ধ ভাবে পূর্ব্ব দিকে

উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গিয়া অস্তমিত হইতেছে; কতকগুলির উদয় ও অস্ত নাই, তাহারা ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়া চক্রাকার গতিতে আবার নিম্নগামী হইতেছে; * এবং অপর এক একটি স্বতন্ত্র ভাবে আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে। †

আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান এই সকল স্বর্ণ-বালুকা-কণার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও, একটি নিয়ম দেখা যায়, যেমন কতকগুলি মানুষের সমষ্টি একটী পরিবার, কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি একটী সম্প্রদায়, কতকগুলি সম্প্রদায়ে একটী জাতি, কতকগুলি জাতিতে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলী, জ্যোতিষ্ক জগতেও সেইরূপ।

পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার—সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এইরূপ কত লক্ষ লক্ষ-জ্যোতিষ্ক-পরিবারের কর্ত্তা কত লক্ষ লক্ষ সূর্য্য—ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তাহার সংখ্যা নাই। নক্ষত্র-খচিত যে অল্পমাত্র আকাশখণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হয় সেই আকাশেই সৌর জগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সকল নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্য—এই সকল সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে ইহাদের গ্রহ উপগ্রহ আমাদের

---

* এই তারকাশ্রেণী, ধ্রুব-তারা-পরিবেষ্টক (Circum-polar) ইহারা দৃশ্যতঃ ধ্রুবতারার চারিদিকে ঘুরে।

† ইহারাই গ্রহ।

দৃষ্টিগোচরই হয় না। জ্যোতির্ব্বিদদিগের অধ্যবসায়ে এই সূর্য্যমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অসংখ্য বৃহত্তর সূর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আকাশের কটি-বন্ধ স্বরূপ ব্রহ্ম-কটাহের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তব্যাপী মৃদুজ্যোতিঃশালী যে সঙ্কীর্ণ আলোক-পথ আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা ছায়া-পথ বলি. সেই ছায়াপথ অতলস্পর্শ অসীম-গভীর একটি তারকাসমুদ্র। দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে এই দুর্ভেদ্য তারকা-সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায় হারসেল তাহাতেই ২০০ লক্ষটি সূর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দূরবীণ যন্ত্রের দৃষ্টিবহির্ভূত যে কত শত ব্রহ্মাণ্ড একটির পর একটি করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে মিশিতেছে এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কত সহস্র সহস্র সূর্য্য সহস্র সহস্র জ্যোতিক জগতের সম্রাটরূপে ঘুরিতেছে তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত।

প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ সহস্র মাইল, কিন্তু আমাদের নিকট হইতে এই সকল অপরিজ্ঞাত তারকাবলী এত দূরে অবস্থিত যে ঐরূপ প্রভূত দ্রুতগতিতে আবহমান কাল দৌড়িয়াও উহাদের আলোক এখনো আমাদের পৃথিবীতে পৌছে নাই। পৃথিবী প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক জগতের কর্ত্তা যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহু লক্ষ গুণ বড় সেই সূর্য্যই যখন এই অনন্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মধ্যে

একটি বিন্দু স্বরূপ—তখন পৃথিবী ইহার একটি অণুকণার সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

আমরা স্বাভাবিক চক্ষে আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম—স্থির নক্ষত্র।

দ্বিতীয়—গ্রহ।

তৃতীয়—উপগ্রহ কিম্বা চন্দ্র।

পৃথিবীবাসী মনুষ্যের পক্ষে যে সকল জ্যোতিষ্ক চির কালই এক স্থানে অবস্থিত বলিয়া মনে হয় তাহারাই স্থির নক্ষত্র নামে অভিহিত। আমরা যে কয়েকটি জ্যোতিষ্ককে সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত বলিয়া জানি—তাহা ছাড়া আমাদের পক্ষে সকলেই স্থির নক্ষত্র; কেন না পৃথিবীর দৈনিক গতি এবং বাৎসরিক গতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অধিকাংশ জ্যোতিষ্কেরই দৃশ্যতঃ এক-রূপ গতি অনুভব করি, অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহাতো আমরা অনুভব করি না কাজেই পৃথিবী যতই ঘুরিতে থাকে আমরা ততই তারকা-রাশিকে ঘুরিয়া যাইতে দেখি; কিন্তু এই দৃশ্যতঃ গতি ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রের সম্বন্ধে অর্থাৎ পরস্পর আপনাদিগের সম্পর্কে ইহাদের দূরত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। শত শত বৎসর পূর্ব্বে হিপারকাস টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ স্থির নক্ষত্র রাশিকে আকাশের যেস্থানে দেখিয়া গিয়াছেন, স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলে আজও তাঁহারা তাহাদিগকে ঠিক

সেই একই স্থানে দেখিতে পাইতেন। আসল কথা ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত প্রভূত দূরে অবস্থিত যে সহস্র সহস্র বৎসরের কমে স্বাভাবিক চক্ষুতে ইহাদের গতি কিছুই অনুভূত হয় না। তবে দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে স্থির নক্ষত্রের পরস্পর দূরত্বের পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষিত হয়।

যে সকল জ্যোতিষ্ক স্থির নক্ষত্রের সম্পর্কে আপনার দৃশ্যতঃ দূরত্ব পরিবর্ত্তন করে তাহারাই গ্রহ উপগ্রহ। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়াই অতি প্রাচীন কাল হইতে বুধ বৃহস্পতি চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগকে স্থির-নক্ষত্র-মণ্ডলী হইতে ভিন্ন-শ্রেণী-ভুক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর জ্যোতিষ্ককে আজ আমরা অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত যে সম্বন্ধে অবস্থিত দেখি কাল তাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাই সুতরাং পৃথিবীর গতি হেতু ইহারা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দৃশ্যতঃ ঘুরিয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের নিজের একটি স্বতন্ত্র গতি আমাদের চক্ষে প্রতীত হয়।

যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে তাহাকেই আমরা গ্রহ বলি, কতকগুলি এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে যাহা দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক চক্ষে আমরা দেখিতে পাই না—ইহাদিগকে গ্রহখণ্ড (Asteroid) বলে, এবং গ্রহগণের চারিদিকে আবার যাহারা ঘুরে তাহাদের নাম উপগ্রহ। চন্দ্র ছাড়া অন্য উপগ্রহও দূরবীণ ব্যতীত দেখা যায় না।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক ব্যতীত ধূমকেতু, নীহারিকা-রাশি এবং উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি অন্য শ্রেণীভুক্ত যে সকল জ্যোতিষ্ক আছে তাহা সচরাচর আমরা স্বাভাবিক চক্ষে আকাশে দেখিতে পাই না। ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড আমরা কখনো কখনো স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে পাই বটে কিন্তু নীহারিকা-রাশি দূরবীণ ব্যতীত স্বাভাবিক চক্ষে কখনই দেখিতে পাই না। সেই জন্য এস্থলে তাহাদের উল্লেখ হইল না।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমরা যে সকল গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাই তাহারা সূর্য্য-পরিবার-ভুক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যকে লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি গ্রহ রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

কিন্তু রাহু ও কেতু প্রকৃত পক্ষে কোন জ্যোতিষ্কই নহে, এবং চন্দ্র সূর্য্যও গ্রহ নামে বাচ্য হইতে পারে না—সূর্য্য একটি স্থির নক্ষত্র, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ; এবং চন্দ্র সূর্য্য পূর্ণিমা অমাবস্যার সময় যে স্থলে আসিলে গ্রহণ হয় সেই দুই স্থানকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাহু ও কেতু নাম দিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি, ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত ইয়ুরেনাস, এবং নেপচুন, এই আটটি সূর্য্যের গ্রহ। ইহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ গ্রহের উপগ্রহ আছে। *

---

* সূর্য্য এবং গ্রহগুলির পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ গণনার

মঙ্গল বুধ ও শুক্র ছাড়া আর সকল গ্রহ অপেক্ষাই পৃথিবী আয়তনে ছোট। এবং এই অষ্ট গ্রহের সমষ্টিতে যে আয়তন হইতে পারে সূর্য্য তাহা অপেক্ষাও বৃহদায়তন। সূর্য্যের পরিবার আবার দুই দলে বিভক্ত। প্রথম নিকটস্থ দল, দ্বিতীয় দূরস্থ দল। সূর্য্য হইতে দূরত্ব অনুসারে পর্য্যায়-

---

দ্বারা গ্রহগণের গতিবিধি নির্দ্ধারিত করা যায়। ইয়ুরেনস গ্রহটির গতি, জ্ঞাত গ্রহগুলির মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইতেছে না দেখিয়া ফরাসী পণ্ডিত লেভিরিয়ে এবং ইংরাজ পণ্ডিত অ্যাডাম্‌স্ ঠিক করিলেন অবশ্য এমন আর একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ আছে যাহার আকর্ষণে ইয়ুরেনসের গতির গণনার ব্যতিক্রম হইতেছে। এই ঠিক করিয়া নেপচুন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই লেভেরিয়ে এবং অ্যাডাম্‌স্ সেই অজ্ঞাত গ্রহটির কক্ষ, ভার, আয়তন সকল স্থির করেন। পরে নির্দ্ধারিত স্থানে দূরবীণ সংযোগ দ্বারা নেপচুন আবিষ্কৃত হয়। ইয়ুরেনসের ন্যায় বুধের গতিরও এই রূপ অল্প ব্যতিক্রম দেখিয়া লেভেরিয়ে বলেন সূর্য্যের ও বুধের মধ্য-স্থিত কোন অজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণে বুধের গতিকে ঈষৎ অন্যরূপ করিতেছে। সেই অবধি অনেকেই বুধ ও সূর্য্যের মধ্যে একটি গ্রহ কিম্বা ক্ষুদ্র গ্রহমালা আবিষ্কার করিতে যত্ন করিতেছেন। এবং মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ আবিষ্কারক হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও প্রসিদ্ধ কোন জ্যোতির্ব্বেত্তারও এরূপ গ্রহ নয়নগোচর না হওয়ায় বৈজ্ঞানিক জগতে এই আবিষ্ক্রিয়া এখনো গ্রাহ্য হয় নাই।

ক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এই চারিটি গ্রহ সূর্য্যের নিকটে এবং বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেনস্ ও নেপচুন দূরে অবস্থিত। কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ উপরোক্ত দুই দলের মধ্যে থাকিয়াই উহাদিগকে ভাগ করিয়াছে।

অনন্ত কাল হইতে এই সকল গ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ধাবমান ইহার কারণ কি? কি শক্তির বলে এইরূপ হইতেছে? শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর বস্তুকে চালিত করিলে আবার কতক্ষণ পরে ইহা থামিয়া যায়, উর্দ্ধক্ষিপ্ত পদার্থ ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে; ইহা দেখিয়া কেপলার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল গ্রহদিগকে চিরন্তন একই পথে চালিত করিতে নূতন নূতন শক্তির প্রয়োজন। তাঁহারা বলিতেন সূর্য্য হইতে এক শক্তি নির্গত হইয়া গ্রহদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং অপর এক শক্তি পৃথিবীকে গতি প্রদান করিতেছে। টলেমি প্রভৃতি আবার যে সকল প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিতেন যে সূর্য্যাদি নক্ষত্র প্রত্যহ পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিতেছে তাঁহাদের মতে পৃথিবী স্থির সুতরাং পৃথিবীকে চালাইতে তাঁহাদের নূতন শক্তির অবতারণা করিতে হয় নাই।

শক্তি যে অবিনশ্বর এবং কোন বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করিলে বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে শক্তির চালকতা যে চির কাল থাকিবে এসত্যটি প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন না। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নিউটনের

অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক গেলিলিও ও হাইগেন্স্ গতিবিষয়ক অনেকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেন। নিউটন তাহার পরে গতি বিষয়ক সমস্ত নিয়ম বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করেন এবং যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে সেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তিনিই প্রথমে বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতির দৃশ্যতঃ বৈষম্যের মধ্যেও যে একটি বিশেষ সাম্য আছে তাহা তাঁহার চক্ষেই প্রথমে প্রতিভাত হয়। যে শক্তির বলে বৃন্তচ্যুত আম্র পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে, এক খণ্ড প্রস্তর উঠাইতে আমাদের বলের প্রয়োজন হয়, সেই শক্তির বলেই যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে চলিতেছে ইহা তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন।

নিউটনের বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া বিশেষরূপ বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রস্তাব নহে, তবে মাধ্যাকর্ষণের স্থূল নিয়ম এই ;

প্রথম, বিশ্বসংসারের প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করিতেছে।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক অণু যখন আকর্ষণশক্তির আধার তখন যে পদার্থে অণু-সমষ্টি অধিক, তাহার কলেবর হ্রস্ব হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তি অধিক। এবং দুইটি পদার্থের মধ্যে যেটি অধিক অণুবিশিষ্ট তাহা অপরটিকে টানিয়া আত্মসাৎ করে।

তৃতীয়, পদার্থদিগের মধ্যে দূরত্বের বর্গ পরিমাণ অনুসারে

এই আকর্ষণ-শক্তির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক হইবে তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ এক চতুর্থাংশ হইবে, এবং অর্দ্ধেক ব্যবধান হইলে আকর্ষণের বল চতুর্গুণ হইবে।

নিউটন আরো বলেন কোন বস্তু একবার চালিত হইয়া যতক্ষণ বাধা না পায় ততক্ষণ ক্রমাগত চলিতে থাকে। পৃথিবী হইতে আমরা যদি কোন প্রস্তর-খণ্ড ছুড়ি তাহা চিরকাল না চলিবার প্রধান কারণ দুই; প্রথম, বাতাসের বাধা; দ্বিতীয়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি।

এখন প্রশ্ন এই যদি প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করে এবং অধিক অণুবিশিষ্ট বস্তু অল্প-অণুবিশিষ্ট বস্তুকে আত্মসাৎ করে তাহা হইলে সূর্য্য, গ্রহ-মণ্ডলীকে কেন আত্মসাৎ করে না?

যদি কেবল মাত্র সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তিই গ্রহদিগের উপর কার্য্য করিত তাহা হইলে গ্রহগণ সূর্য্য দ্বারা বিলুপ্ত হইত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সৌরাকর্ষণ ব্যতীত গ্রহদিগের নিজের নিজের আবার একটি গতি আছে।

শক্তির একটী সাধারণ ধর্ম্ম এই যে শক্তি দ্বারা কোন পদার্থ একবার চালিত হইয়া যদি অন্য কোন প্রতিবাধক শক্তির দ্বারা বাধা না পায় তবে, তাহা চিরকাল সরল রেখা-পথে চলিবে, এ নিমিত্ত, সূর্য্যের

আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহগণ সরল-রেখাভিমুখে পলায়ন করিতে যত্নশীল। ইহাকেই কেন্দ্রাতিগ গতি বলে। সূর্য্য ক্রমাগত যতই গ্রহদের আপন কেন্দ্রাভিমুখে টানিতেছে গ্রহগণ ততই সেই আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া সরল রেখায় পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। কাজেই এই দুই শক্তি-প্রভাবে গ্রহগণ একটি বৃত্তাকার পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি মুহূর্ত্তের জন্য কখনো কোন গ্রহ আপন গতি শক্তি হারায়, তাহা হইলে অমনি বৃহদায়তন সূর্য্য তাহাকে টানিয়া আত্মসাৎ করিয়া
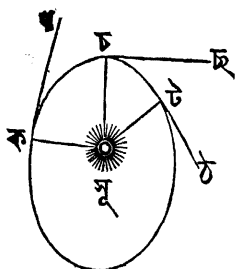
ফেলিবে। উপরের চিত্রটি হইতে গ্রহ দিগের গতি কিয়ৎ-পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। সূ চিহ্নিত চিত্রটি এ স্থলে সূর্য্য এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃত্তাকার রেখাটি পৃথিবীর

সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথ। পৃথিবী যখন ক চিহ্নিত স্থানে পৌছিয়া খ সরল রেখায় যাইতে যত্নশীল তখনি সূর্য্যের কেন্দ্রাকর্ষণ দ্বারা খ স্থানে যাইতে না পাইয়া বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়া পড়িতেছে, এইরূপে ক্রমে চ চিহ্নিত স্থানে সরিয়া সেখান হইতে আবার সরল রেখায় যাইতে উদ্যত কিন্তু সূর্য্য তাহাতে বাধা দিয়া আবার টানিতে থাকে তখন পৃথিবী ট স্থানে ঘুরিয়া আসিয়া ঠ রেখায় পলাইতে যায়।

এইরূপে সূর্য্যের আকর্ষণ ও নিজ নিজ কেন্দ্রাতিগ শক্তির বলে গ্রহগণ সূর্য্যকে ক্রমাগত আবর্ত্তন করিতেছে। এই দুই শক্তির যতক্ষণ সামঞ্জস্য ততক্ষণ কেহই কক্ষচ্যুত হয় না, ইহার কোনটার আধিক্য হইলেই অমনি বিশৃঙ্খলতা ঘটে। ধূমকেতুর অতি জটিল গতিবিধিও এই নিয়ম-প্রসূত। গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই দুইটি নিয়ম অবলম্বন করিয়া অবরোহী প্রণালী অনুসারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন।

যে সকল গ্রহ উপগ্রহের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা ব্যতীত আমরা কখনো কখনো যে ধূমকেতু এবং উল্কাপিণ্ড দেখিতে পাই, তাহারা সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত কিম্বা সৌর-জগতের অতিথি মাত্র এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন কাল হইতে একটি কুসংস্কার দেখা যায়। 'ধূমকেতোরুদয়েন প্রজাক্ষয়ং সূচ্যতে' ধূমকেতু যেরূপ পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা গ্রহগণ হইতে ভিন্ন

প্রকারের, সেই জন্য ধূমকেতুর সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে অনেক বৎসর লাগে, এমন অনেক ধূমকেতু দেখা গিয়াছে যে তাহারা একবার উদয় হইয়াই অমনি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। ঐ সকল ধূমকেতু সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আর ফিরিয়া আসিবে কি না তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কেবল নয়টি ধূমকেতুর সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার সময় কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত। এই নয়টির মধ্যে হ্যালি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ধূমকেতু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ে এবং এন্‌কি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ধূমকেতু সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। প্রথমটি ন্যূনাধিক ৭৬ বৎসরে এবং দ্বিতীয়টি ন্যূনাধিক ৩ বৎসরেই এক একবার উদিত হয়। ইহা ছাড়া অনেক ধূমকেতু এত বহু সহস্র বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে যে আমাদের নিকট তাহা যুগযুগান্তর জ্ঞান হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুটি উদিত হইয়াছিল তাহার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-সময় এক লক্ষ বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ধূমকেতুর কক্ষ যেমন গ্রহগণের অপেক্ষা ভিন্ন তেমনি অন্যান্য বিষয়েও গ্রহগণ হইতে ধূমকেতু ভিন্ন। ধূমকেতুর গুরুত্ব অতি অল্প; এমন কি অনেক বাষ্প অপেক্ষাও ইহা লঘু। ধূমকেতু লম্বায় সহস্র সহস্র ক্রোশ হইলেও উহাকে স্বচ্ছন্দে একটা বড় বোতলে ধরিয়া রাখা যায়।

যে সকল জ্যোতিষ্ককে মধ্যে মধ্যে আমরা খসিয়া পড়িতে দেখি তাহাদের সাধারণ নাম উল্কাপিণ্ড। সচরাচর আমরা ইহাকে তারা খসা বলি। উল্কাপিণ্ডের মধ্যে আবার একটি বিশেষ দল (Zodiacal light) সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। প্রতি বৎসর শরদাগমে অধিক সংখ্যায় আমরা উল্কাপাত দেখিতে পাই। ইহাদের সবিশেষ তথ্য এখনো আমরা অবগত নহি।

আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তারা ঠিক করিয়াছেন যে উল্কা-পিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে পথে উল্কাপিণ্ড পরিভ্রমণ করে সেই পথেই ধূমকেতু উদিত হয়। বোধ হয় বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল নীহারিকাময় ধূমকেতু উৎপাদন করে।

এই সৌর-পরিবার-ভুক্ত পৃথিবী পূর্ব্বোক্ত দুইটি শক্তির অধীনে কি প্রণালীতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা এই বার দেখা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পৃথিবীর গতি প্রণালী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বুধ মঙ্গল ও শুক্র ছাড়া আর সকল গ্রহ অপেক্ষাই পৃথিবী আয়তনে ছোট। পৃথিবীর বিষুবরেখার ব্যাস প্রায় ৭৯২৫ মাইল, এবং মেরু-ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল মাত্র। আয়তনে পৃথিবী ২৬১০০০০ লক্ষ ঘন মাইল এবং ভূপৃষ্ঠ ১৯৭৩১০০০০ বর্গ মাইল মাত্র। পৃথিবী গোলাকার এবং ইহার প্রত্যেক মেরু ১৩ মাইল করিয়া চাপা—অর্থাৎ মেরুদ্বয়ে আর ২৬ মাইল স্থান থাকিলে সম্পূর্ণ গোলাকার হইত। পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণ একখানি চলিত ভূগোল গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় সুত-রাং এস্থানে এই আকৃতি সম্বন্ধে বহুল বর্ণনা না করিয়া একেবারে ইহার গতি-আলোচনাই আরম্ভ হইল।

আমরা দেখিতে পাই পর্য্যায়-ক্রমে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আইসে। সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমে অস্তমিত হয়। ইহাতে সহজেই বোধ হইতে পারে একদিনে সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া আসে। রাত্রে আকাশের নক্ষত্র দেখিলেও এইরূপ মনে হয় সেই জন্য পুরাকালে সর্ব্বত্রই বিশ্বাস ছিল যে স্থির পৃথিবীকে

কেন্দ্র-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল মণ্ডলাকারে তাহার চারি দিকে পরিভ্রমণ করে। যদিও টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী হিপার্কস নামে একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা এই মতটির উদ্ভাবক তথাপি দ্বিতীয় খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্য ভাগে মিশর দেশীয় টলেমিই প্রথমে ইহা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করেন এনিমিত্ত তাঁহার নাম হইতে জ্যোতিক-জগতের এই কল্পিত ভ্রমণ-প্রণালীকে টলেমিক প্রণালী কহে। খৃষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে এই মত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। পরে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোপর্ণিকস ইহার ভ্রম দেখাইয়া সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এক একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিক আবর্ত্তন করে সেই জন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর ঐরূপ দৃশ্যমান গতি অনুভূত হয়। কিন্তু কোপর্ণিকস ইউরোপে ১৫ শ শতাব্দীতে যে সত্যটি প্রমাণ করেন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ তাহার বহু পূর্ব্বে সে সত্যটি জানিতেন। জ্যোতির্ব্বিদ-শ্রেষ্ঠ আর্য্যভট্ট, কোপর্ণিকসের প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর গতিবিধি পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে ভারতবর্ষে যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ এজন্য যশস্বী হইতে পারিল না।

যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি স্থির থাকে এবং অপরটি চলিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গমনশীল বস্তুর গতি দুই

প্রকারে অনুভূত হইতে পারে। গমনশীল বস্তুর মধ্যে লোক থাকিলে সে এক প্রকার গতি অনুভব করে,আর স্থির বস্তুর মধ্যে যে লোক থাকে সে আর এক প্রকার গতি অনুভব করে। প্রথমোক্ত লোক মনে করে নিজের অধিকৃত বস্তু স্থির আছে এবং স্থির বস্তুটি বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত অনুভব করে। সৌর জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। পৃথিবী, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় একটি বালুকা-কণা হইতেও ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অসীম। এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের, পৃথিবীর চারিদিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ঘুরিতে অনন্ত গতি শক্তির আবশ্যক, এবং পরস্পর হইতে অসীম দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী যে ঠিক একই সময়ে পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিবে ইহাও সম্ভাব্য নহে। এই নিমিত্ত কোপর্নিকস প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া আপনাকে আপনি একবার আবর্ত্তন করে, সেই জন্য আমাদের মনে হয় সূর্য্যাদি নক্ষত্রমণ্ডলী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ববাদিসম্মত বিশ্বাস এই যে পৃথিবী ঈষদূন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে, (ইহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি) এবং সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবী-সম্পর্কে স্থির। এই আহ্নিক গতিই দিন রাত্রির কারণ।

আহ্নিক গতি দ্বারা পৃথিবীর যখন যে অংশ সূর্য্যাভি-মুখী হয় তখন সেই ভাগে দিন, আবার সূর্য্য হইতে যে ভাগ যখন ফিরিয়া অন্য দিকে যায় সেই ভাগে তখন রাত্রি হয়।

কোন একটি দীপের সম্মুখে একটী গোলাকার বস্তু রাখিয়া ঘুরাইয়া দেখিলে আমরা দিন রাত্রের বিভাগ সহজেই বুঝিতে পারি।
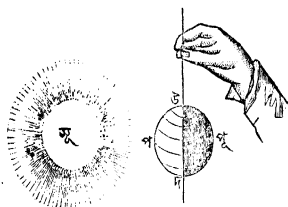
প্রথম চিত্র।

উপরের সূ চিহ্নিত ছবিটি যেন সূর্য্য আর দণ্ডে বিদ্ধ গোলাকার বস্তুটি যেন পৃথিবী। গোলাকার বস্তুর যে দুই প্রান্ত দিয়া ঐ দণ্ডটি চলিয়া গিয়াছে সেই দুইটি প্রান্ত পৃথিবীর দুইটি মেরু—উপরটি উত্তর, নিম্নটি দক্ষিণ—এবং মধ্যে লম্বমান যে দণ্ডটি দ্বারা এই দুই মেরু সংযুক্ত তাহা যেন পৃথিবীর মেরুদণ্ড। উভয় মেরু হইতে সর্ব্বত্র সমদূরে রাখিয়া গোলাকার বস্তুটির মধ্য দেশে যদি একটি বৃত্ত টানা যায় সেইটি পৃথিবীর বিষুবরেখা। উপরি উক্ত কল্পিত মেরু-

দণ্ডের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে। ঘুরিয়া যখন পশ্চিম অর্দ্ধাংশ একটু একটু করিয়া মেরুদণ্ডের পূর্ব্বে আসিতেছে তখনি তাহা সূর্য্যের বিমুখে পড়িয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে, এবং পূর্ব্ব অর্দ্ধাংশ পশ্চিমে আসিয়া সূর্য্যাভিমুখে পড়ায় আলোক পাইতেছে। এইরূপে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে একবার দিন একবার রাত্রি হয়, এক অর্দ্ধাংশে যখন রাত্রি অপর অর্দ্ধাংশে তখন দিন থাকে।

আমরা প্রত্যহ যে সময় সূর্য্যকে উদয় হইতে দেখিতে পাই তাহার ২৪ ঘন্টা পরে আবার সূর্য্য উদিত হয় এই নিমিত্ত আমরা বুঝিতে পারি পৃথিবীর যে স্থান সূর্য্য হইতে বিমুখে যাইতে আরম্ভ করে; সে স্থানের আবার সূর্য্যাভিমুখে আসিতে ২৪ ঘন্টা লাগে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে।

চিত্রিত গোলাকার বস্তুটিকে তাহার মেরুদণ্ডের উপর যেরূপ সোজা ভাবে রাখা হইয়াছে দণ্ডে বিদ্ধ কোন গোলাকার বস্তুকে ঠিক এই রূপ সোজা ভাবে রাখিয়া কোন দীপের চারিদিকে ঘুরাইলে দেখা যাইবে গোলাকার বস্তুর এক অর্দ্ধাংশ যতক্ষণ আলোকে থাকিবে, অপরার্দ্ধ ঠিক ততক্ষণ অন্ধকারে থাকিবে। কেন না গোলাকার বস্তুটি এখন যে পথে ঘুরিতেছে তাহা এই বস্তুটির মেরুদণ্ড দ্বারা ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত। সেই জন্য এই মেরুদণ্ডই অন্ধকার ও আলোকের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতেছে।

পৃথিবী যদি এই গোলাকার বস্তুর ন্যায় আপন মেরু-দণ্ডকে অয়নমণ্ডলের উপর ঠিক সোজা ভাবে রাখিয়া ঘুরিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল স্থানে সকল সময় দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান থাকিত। কিন্তু বাস্তব পক্ষে সকল সময় সকল স্থানে দিন রাত্রি সমান থাকে না। আমরা শীত কালে যখন দিন ছোট রাত্রি বড় এবং গ্রীষ্ম কালে দিন বড় রাত্রি ছোট দেখিতে পাই তখন পৃথিবী উপরের চিত্রটির ন্যায় আপন গতির পথে ঠিক সোজা ভাবে মেরুদণ্ড রাখিয়া ঘোরে না। পৃথিবী অয়নমণ্ডলের উপর কিরূপ ভাবে থাকিয়া ঘুরিলে দিন রাত্রের এরূপ বৈষম্য হইতে পারে তাহা নিম্নের চিত্রটি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।
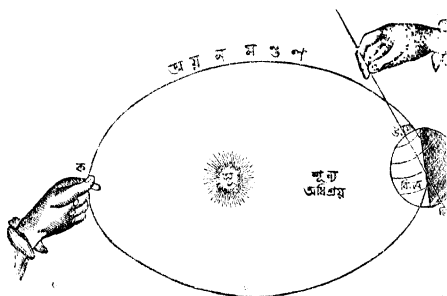
দ্বিতীয় চিত্র।

উপরের চিত্রটির ন্যায় একটি গোলাকার লৌহ তার

বাম হস্তে ধরা যাউক। সেই গোলাকার তারটি যেন পৃথিবীর অয়নমণ্ডল। ঐ অয়নমণ্ডলের মধ্যে যেমন সূর্য্য চিত্রিত হইয়াছে সেই তারের মধ্যে তেমনি একটি দ্বীপ রাখা হউক। তাহার পর দণ্ডবিদ্ধ কোন গোলাকার বস্তুর দণ্ডটি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া উপরের চিত্রটির ন্যায় তাহাকে তারের গাত্রে ঈষৎ হেলাইয়া বাতিটির চারিদিকে ঘোরান যাউক তাহা হইলেই পৃথিবীর দিন রাত্রের বৈষম্যের কারণ বুঝা যাইবে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন গোলাকার বস্তুকে নিজের চারি দিকে ঘুরাইলে তাহার সকল অংশ যতক্ষণ আলোকে থাকিবে ঠিক ততক্ষণ আবার অন্ধকারে থাকিবে না। বরঞ্চ তদ্বিপরীতে যে অংশ যখন আলোকে অধিক ক্ষণ থাকিবে সে অংশ তখন অন্ধকারে অল্প ক্ষণ থাকিবে, এবং তাহার বিপরীত অংশ আবার সেই সময় আলোকে অল্প ক্ষণ থাকিয়া অধিক ক্ষণ অন্ধকারে থাকিবে।

উপরের চিত্রিত গোলাকার পৃথিবী স্থির মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া অয়নমণ্ডলে যেন কৌণিক ভাবে ঘুরিতেছে। উত্তর মেরু এখন সূর্য্যের অভিমুখে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে হেলিয়া আছে। সেই নিমিত্ত উত্তর ভাগে—অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তর দিকে যত পরিমাণে দিবসের দৈর্ঘ্য বিষুবরেখার দক্ষিণ ভাগে তত পরিমাণে রাত্রের দৈর্ঘ্য অধিক, কেবল ঠিক বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে দিবা রাত্রি সমান। যতক্ষণ পৃথিবী এই অবস্থায় থাকিয়া

ঘুরিবে ততক্ষণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ঘুরিয়া গেলেও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের অভিমুখী ও উত্তর মেরু সূর্য্যের বিমুখী হইবে না সুতরাং দক্ষিণ মেরুতে ২৪ ঘণ্টাই রাত্রি—ও উত্তর মেরুতে ২৪ ঘণ্টাই দিন থাকিবে।

এদিকে পৃথিবীর ঘুরিবার সময় দক্ষিণ মেরু হইতে দূরবর্ত্তী স্থান সকল তাহাদের দূরত্বের পরিমাণ অনুসারে ক্রমেই একটু একটু করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে পড়িতেছে তবে বিষুবরেখা ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবর্ত্তী স্থল যতটুক সূর্য্যের অভিমুখে পড়িতেছে—তাহা অপেক্ষা অধিক ভাগ বিমুখে পড়িতেছে—সেই জন্য এখানে রাত্রির দীর্ঘতা অধিক। অধিক স্থল অতিক্রম করিয়া সূর্য্যাভিমুখী হইতে কাজেই ইহার অধিক সময় লাগে।

কিন্তু বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে আবার দিনরাত্রি সমান দীর্ঘ—কেন না বিষুব-রেখার ঠিক অর্দ্ধভাগ সূর্য্যাভিমুখে এবং অপরার্দ্ধ ভাগ সূর্য্যের বিমুখে পড়িতেছে—সুতরাং বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশের সূর্য্যাভিমুখী হইতেও যে সময় লাগে ইহার বিমুখে পড়িতেও সেই সময় লাগে। তাহার পর বিষুবরেখা ছাড়াইয়া যতই উত্তরে যাওয়া যাইবে ততই দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া বাড়িয়া উত্তর মেরুতে পৌছিলে একেবারে আলোকের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বিষুবরেখার উত্তর অংশ ক্রমেই অধিক পরিমাণে সূর্য্যাভিমুখী হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মেরু প্রদেশ

একেবারে সূর্য্যের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে-সেই জন্য এ মেরুতে ২৪ ঘণ্টাই দিন।

এইরূপে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মেরু পর্য্যন্ত আসিলে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রের রাজত্ব হইতে ক্রমশ আমরা নিরবচ্ছিন্ন দিনের রাজত্বে আসিয়া পড়ি, এবং মধ্যস্থানে দিন রাত্রি সমান দেখিতে পাই। পৃথিবীর বিষুবরেখা বা কটিদেশের দুইটি স্থান প্রত্যহ অয়নমণ্ডলকে ছুঁইয়া ছুইয়া যায় এবং সেই দুই বিন্দু দ্বারাই অন্ধকার ও আলোকের সমান বিভাগ করিতেছে, কাজেই কটিদেশে দিনরাত্রি সমান।

অয়নমণ্ডলে কৌণিক ভাবে থাকিয়া প্রত্যহ পৃথিবী একবার করিয়া আপন মেরুদণ্ড যেন আবর্ত্তন করিতেছে—এই আবর্ত্তন হেতু যেন দিন রাত্রির বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে কিন্তু প্রশ্ন এই পৃথিবীতে চিরকাল একই মেরুতে দিন, একই মেরুতে রাত্রি ও একই স্থানে রাত্রের দৈর্ঘ্য একই স্থানে দিবসের দৈর্ঘ্য না থাকিয়া কখনো উত্তর মেরু অন্ধকার কখন আলোকিত কখনো একস্থানে দিন ছোট আবার কখন দিন বড় এরূপ পরিবর্ত্তন হয় কেন?

আহ্নিক গতিই পৃথিবীর একমাত্র গতি হইলে সময়-ভেদে দিন রাত্রির এরূপ দৈর্ঘ্য প্রভেদ হইত না সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, আপনার চারি দিকে প্রত্যহ একবার করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী

এক বৎসরে সূর্য্যকে আবার একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। প্রতিদিন সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির স্থান পরিবর্ত্তনই ইহার প্রমাণ। কেবল আহ্নিক গতিই যদি পৃথিবীর একটি মাত্র গতি হইত তাহা হইলে প্রতিদিন সূর্য্য একই স্থানে উদয় হইত। অর্থাৎ আজ সূর্য্য যে নক্ষত্ররাশির নিকটে উঠিত, চিরকালই সেই স্থানে তাহাকে আমরা উঠিতে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা হয় না, যদি আমরা সূর্য্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে সূর্য্য চৈত্র মাসের এক দিন ঠিক পূর্ব্বে উদয় হইয়া ঠিক পশ্চিমে অস্ত যায়, তাহার পর দিন হইতে সূর্য্য উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া একটু উত্তর পূর্ব্বে উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপ প্রত্যহ ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া তিন মাস পরে যতদূর সম্ভব উত্তরে যায়, আবার বক্রগতিতে ফিরিয়া তিন মাসের পর ঠিক পূর্ব্বে উদয় হয়। পরে প্রথমে যেরূপ উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—এবং তিন মাস পরে দক্ষিণে যতদূর যাইবার গিয়া আবার দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বে ফিরিতে আরম্ভ করে। এইরূপ একবার উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আবার উত্তর প্রান্তে ফিরিয়া আসিতে সূর্য্যের এক বৎসর লাগে—এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ যাইবার সময় একবার এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে ফিরিয়া আসিবার সময় একবার পূর্ব্বে উদিত হয়। সূর্য্যের

এই দৃশ্যতঃ গতি দ্বারা আকাশে একটি বৃত্তাভাষ অঙ্কিত হয় তাহাকে রাশিচক্র বা সূর্য্যের অয়নমণ্ডল কহা যায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি সূর্য্য স্থির, তবে সূর্য্যের এই দৃশ্যমান গতি হয় কেন? পৃথিবী দিন দিন সূর্য্য হইতে একটু একটু করিয়া সরিয়া আবার এক বৎসরে সেই পূর্ব্বস্থানে আইসে এই নিমিত্তই আমাদের মনে হয় সূর্য্য স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। এই গতির নিমিত্ত সূর্য্যের ন্যায় তারাদিগকেও আমরা প্রত্যহ স্থান পরিবর্তন করিতে দেখিতে পাই। যদি একই স্থানে থাকিয়া পৃথিবী প্রত্যহ নিজ মেরুদণ্ড আবর্ত্তন করিত তাহা হইলে আজ আমরা সন্ধ্যাকালে যে নক্ষত্রমালা দেখিতে পাইতাম চিরকাল ধরিয়া সন্ধ্যাকালে সেই তারকাগুলিই দেখিতাম। আজ আমরা দ্বিপ্রহর রাত্রে যে তারকাগুলি দেখিলাম চিরকাল দ্বিপ্রহর রাত্রে সেইগুলি সেইস্থানে দেখা দিত, এবং চিরদিন উষাকালে একই তারকা-রাশি দেখিতে পাইতাম। এক কথায় মেরুদণ্ড আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে আকাশভাগ যে সময় আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িত, ঠিক সেই অংশ আমরা চিরকালই সমান দেখিতে পাইতাম। কিন্তু বাস্তব পক্ষে আমরা চির কাল ধরিয়া এক সময়ে একই তারকা-মালা দেখিতে পাই না, যে তারকামালা গ্রীষ্ম কালের দ্বিপ্রহর রাত্রে দেখা দেয় তাহা আর শীত কালের দ্বিপ্রহর রাত্রে দেখা যায় না, সে সময় আমরা অন্য তারা দেখিতে

পাই। ৬ মাস আমরা মস্তকের উপরকার ব্রহ্মকটাহে যে সকল তারা দেখি আর ৬ মাস তাহারা সেই সময় আমাদের পদনিম্নের ব্রহ্মকটাহে থাকে, সেই জন্য প্রতি ৬ মাসে আমরা ভিন্ন ভিন্ন তারকা-মালা দেখিতে পাই। অথবা সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর একদিক হইতে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় রাত্রি শেষে অতি প্রত্যুষে সেই সমুদায় নক্ষত্র অন্তর্হিত হইয়া ঠিক্ বিপরীত দিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়,তবে প্রভেদ এই, এক সময়ে আজ যে সকল নক্ষত্র উপরে, ছয় মাস পরে সেই সমুদায় নক্ষত্র নীচে, এবং নীচের নক্ষত্র উপরে আসিবে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায়, দিন দিন তারাগুলি কিরূপে পশ্চিমে সরিয়া সরিয়া উদিত হইয়া কিছুদিন পরে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, এবং ঠিক এক বৎসর পরে আবার সেই পূর্ব্বস্থানে উদিত হয়। সূর্য্যকে ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিতে পৃথিবীর যে এক বৎসর লাগে এই তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর উভয় মেরুবর্ত্তী তারকা ব্যতীত সূর্য্য পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল তারারই উপরোক্ত রূপ দৃশ্যতঃ গতি হয়। পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের উপরকার আকাশে যে সকল তারকা আছে, তাহারা কখন অদৃশ্য হয় না। কারণ পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলের উপর যে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট *

---

* ডিগ্রি, মিনিট প্রভৃতি দ্বারাই বৃত্তের পরিমাণ স্থির হয়। একটি ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া দেখিলে ডিগ্রি

কৌণিক ভাবে অবস্থিত তাহা চিরকালি প্রায় একরূপ

বুঝা যাইতে পারে। ঘড়ির একটি কাঁটা দুপ্রহরের ঘরে রাখিয়া আর একটি কাঁটা ৩টার ঘরে রাখিলে দেখা যাইবে যে দুইটা কাঁটা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ দুই কাঁটার মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এক সমকোণ। পরে তিনটার ঘর হইতে শেষের কাঁটাটিকে যদি ৬টার ঘরে আনা যায় তাহা হইলে দুইটি সমকোণ এবং ৯টার ঘরে আনিলে ৩টি সমকোণ এবং বারটার ঘরে আনিলে ৪টি সমকোণ হইবে। এইরূপ ঘর ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার অগ্রভাগ দ্বারা একটি বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় একটি বৃত্তে চারিটি সমকোণ আছে। বৃত্তের আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি করিলে এই ৪টি সমকোণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। বৃত্ত বড় করা অর্থে দাঁড়াইতেছে কেবল কাঁটার দৈর্ঘ্য বাড়ান আর বৃত্ত ছোট করার অর্থে দাঁড়াইতেছে কাঁটার দৈর্ঘ্য কমান, কিন্তু তাহাতে কোণের পরিমাণের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যেক বৃত্তে চারিটি সমকোণ থাকিবেই থাকিবে। মাপের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সমকোণকে ৯০ ভাগ করা যায় এবং এক সমকোণকে ৯০ ভাগ করিলে চারিটি সমকোণে অর্থাৎ একটি বৃত্তে ৩৬০ ভাগ হইবে। ইহার এক একটি ভাগ এক এক ডিগ্রি। ডিগ্রি আবার ৬০ মিনিটে ও মিনিট ষাট সেকেণ্ডে বিভক্ত। ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ডিগ্রি, ৯০ ডিগ্রিতে এক সমকোণ, ৪ সমকোণে এক বৃত্ত। বৃত্ত মাপিবার আর একটি নিয়ম এই বৃত্তের কোন অংশ মাপিতে গেলে সেই অংশের উভয় সীমা হইতে কেন্দ্র

সমান ভাবে রহিয়াছে, † সেই জন্য উভয় মেরুর লক্ষ্য ঠিক একই দিকে নিবদ্ধ। একটি ভাঁটা গড়াইয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। একটি ভাঁটা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে সোজা গড়াইয়া দাও, ঘুরিবার সময় ইহার দুই প্রান্ত ছাড়া অন্য সকল অংশই একবার করিয়া নিম্নাভিমুখী ও একবার করিয়া উর্দ্ধাভিমুখী হইবে। যদি ভাঁটাটি কোন রূপ ক্ষুদ্র জীবের বাসস্থান হয় এবং মাটীর পরিবর্ত্তে শূন্যে ঘুরিতে থাকে তাহা হইলে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যেক অংশের জীব একবার করিয়া নিম্ন আকাশ এবং একবার করিয়া উর্দ্ধ আকাশ দেখিতে পাইবে। কিন্তু ভাঁটাটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যতই ঘুরুক তাহার প্রান্তের জীবগণ উত্তর দক্ষিণ আকাশ ছাড়া অন্য স্থানের জীবগণের ন্যায় সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকাশখণ্ড কখনই দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ পৃথিবীর মেরু-

---

পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে তাহাদের মধ্যে যে পরিমাণ কোণ উৎপন্ন হয় উল্লিখিত বৃত্তাংশেরও সেই পরিমাণ হইবে।

† সূক্ষ্ম গণনায় এখন বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ সেকেণ্ড করিয়া পৃথিবীর এই কৌণিক অবস্থানের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে কিন্তু ইহা চিরকাল চলিবে না। হ্রাস বৃদ্ধি ১ ডিগ্রী ২১ মিনিটের অধিক হয় না। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ গ্রহগণের সমবেত আকর্ষণ।

দ্বয়ের চিরকালি উত্তর দক্ষিণে লক্ষ্য নিবদ্ধ বলিয়া সেখানকার তারকারাশি আর কখনো অস্তমিত হয় না। মেরু দেশে মনুষ্য থাকিলে পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে সঙ্গে তারকারাশি চক্রাকারে তাহাদের ঠিক মাথার উপরকার তারাটির চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত মাত্র, একেবারে তাহাদের নেত্র হইতে কখনই অন্তর্হিত হইত না। এই একই কারণে অর্থাৎ উত্তর মেরুর লক্ষ্য চিরকাল উত্তরে নিবদ্ধ বলিয়াই আমরা উত্তর মেরুবর্ত্তী তারাটিকে (যাহা ধ্রুবতারা নামে খ্যাত) চির কালি সমভাবে একই স্থানে দেখিতে * পাই এবং পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আকাশের তারকাগণ আমাদের নিকট অস্তমিত না হইয়া ধ্রুব তারাটির চারি দিকে ঘুরিতে থাকে। আমরা বিষুবরেখার উত্তরে বলিয়া উত্তর-মেরু-সন্নিহিত তারকা দেখিতে পাই, দক্ষিণ মেরু আমাদের দিগ্বলয় (দৃষ্টি-ব্যাপিকা। Horizon) রেখার নীচে এই জন্য তৎসন্নিহিত তারা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু যাহারা ঠিক বিষুব-রেখাবর্ত্তী দেশে বাস করে তাহারা উভয় মেরুবর্ত্তী তারকাই আকা-

* ধ্রুব তারাটি যে ঠিক মেরুর আকাশে অবস্থিত তাহা নহে। ঠিক মেরুর উপরকার আকাশে কোন তারাই নাই, তবে মেরুর আকাশ হইতে ধ্রুব তারা এত অল্প দূরে যে ইহা-কেই মেরুবর্ত্তী তারা বলা যাইতে পারে। ইহা মেরু হইতে এক ডিগ্রি দূরে মাত্র অবস্থিত। পৃথিবীর ঘুরিবার সঙ্গে

শের উত্তর দক্ষিণ দিগ্বলয়ে সমান দেখিতে পায়। যতই বিষুব রেখা ছাড়াইয়া যাওয়া যায় ততই এক মেরুর আকাশ ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে থাকে এবং অন্য মেরুর আকাশ ছাড়াইয়াও অপর দিকের আকাশে দৃষ্টি চলে, সেই জন্য বিষুব-রেখা হইতে মেরুদ্বয়ের তারকা যেমন ঠিক উত্তর দক্ষিণ দিগ্বলয়ে থাকে বিষুব রেখা ছাড়াইলে তাহা থাকে না। যতই বিষুবরেখা ছাড়াইয়া কোন মেরু অভিমুখে যাওয়া যায় ততই সেই মেরুর তারকা ঠিক আমাদের উত্তর কিম্বা দক্ষিণ দিগ্বলয়ে না থাকিয়া অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, অর্থাৎ মেরু ছাড়াইয়া যত দূরের আকাশে আমাদের দৃষ্টি পড়ে সেই আকাশই ঠিক আমাদের দক্ষিণ কিম্বা উত্তর দিগ্বলয় হয় এবং মেরুবর্ত্তী আকাশ তাহা অপেক্ষা ঊর্দ্ধভাগে আসিয়া পড়ে। এইরূপে উত্তর মেরুতে পৌঁছিলে আমরা দেখিতে পাই বিষুবরেখা-বাসী লোকের নিকট যাহা উত্তর দিগ্বলয় তাহাই ঠিক আমাদের মাথার উপরকার আকাশ। বিষুবরেখা হইতে কলিকাতা প্রায় ৭ শত ক্রোশ উত্তরে বলিয়াই উত্তর মেরুবর্ত্তী ধ্রুব তারাকে ঠিক আমরা উত্তর দিগ্বলয়ে না দেখিয়া কিছু উপরেই দেখিতে পাই।

সঙ্গে ধ্রুব তারা যে একেবারে ঘুরে না তাহা নহে কিন্তু ঘুরিবার সময় এত ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কিত করে যে আমরা স্বাভাবিক চক্ষুতে তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারি না।

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম ২৪ ঘন্টায় যেমন পৃথিবী আপনাকে আপনি একবার আবর্ত্তন করে এক বৎসরে তেমনি সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পৃথিবীর এই দুইটি গতি মিশ্রিত হইয়া যে একটি গতির উৎপত্তি হয় তাহা অনেকটা লাটিমের গতির মত। একটা লাটিমকে ঘুরাইয়া দিলে অনেক সময় সে নিজের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একটি স্বতন্ত্র চক্রাকার পথে যায়। পৃথিবী ঈষৎ বেঁকিয়া বেঁকিয়া ঠিক সেইরূপে আকাশ-পথে সর্প-কুণ্ডলাকৃতি চক্র কাটিতে কাটিতে চলিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে এইরূপে যে চক্রাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাই পৃথিবীর অয়নমণ্ডল। পৃথিবীর অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার নহে ইহা অনেকটা ডিম্বাকৃতি (বৃত্তাভাস)। এই অয়নমণ্ডলের দুইটি অধিশ্রয় (focus) আছে। * একটি অধিশ্রয় শূন্য একটি অধিশ্রয়ে সূর্য্য অবস্থিত। সেই জন্য অয়নমণ্ডলের সকল স্থান সূর্য্য হইতে সমান দূরে নহে।

দ্বিতীয় চিত্রটি দেখিলে দেখা যাইবে খ প্রান্ত সূর্য্য হইতে যেমন অপেক্ষাকৃত দূরে ক প্রান্ত তেমনি অপেক্ষাকৃত নিকটে। এই ডিম্বাকৃতি অয়নমণ্ডল দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

---

* একটি মাত্র কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া যেমন বৃত্ত উৎপন্ন হয়। বৃত্তাভাসের উৎপত্তির নিমিত্ত তেমনি দুইটি কেন্দ্রের আবশ্যক। বৃত্তাভাসের কেন্দ্রের নাম অধিশ্রয়।

পৃথিবী প্রত্যহ নিজের মেরুদণ্ডের চারি দিকে আবর্ত্তন করে বলিয়া যেমন দিন রাত্রি হয় ও অয়নমণ্ডলের উপর সেই মেরুদণ্ড কৌণিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া যেমন দিন রাত্রের দৈর্ঘ্য বৈষম্য হয় পৃথিবী ঘুরিবার সময় তেমনি সূর্য্য সম্পর্কে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন করে সেই হেতু আবার উত্তরার্দ্ধে ও দক্ষিণার্দ্ধে সময়ভেদে রাত্রি দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হয়। যদি পৃথিবী সূর্য্য সম্পর্কে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন না করিত, তাহা হইলে এক মেরু চিরকালি সূর্য্যের বিমুখে ও আর এক মেরু চির কালি তাহার অভিমুখে থাকিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও রাত্রি দিনের দৈর্ঘ্য পরিবর্ত্তন-শীল হইত না—তাহা চিরকালি সমান থাকিত। উত্তর বিভাগে রাত্রি অপেক্ষা দিবস বড় হইলে সেখানে চিরকালই দিবস বড় থাকিত এবং—দক্ষিণ বিভাগে রাত্রি বড় হইলে সেখানে চির-কালই রাত্রি বড় থাকিত, সুতরাং আমরা শীতকালে দিন ছোট ও গ্রীষ্মকালে দিন বড় দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু আমরা যে কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দিন রাত্রের দৈর্ঘ্যের প্রভেদ দেখিতে পাই সেকালে বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী সূর্য্য সম্পর্কে তাহার অবস্থা পরিববর্ত্তন করে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিবারাত্রের দীর্ঘতার প্রভেদ হয়। এই কারণ বশতঃ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর দুই অংশ দুই

বার করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে এবং দুইবার বিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং দুইবার সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া সূর্য্যের সম্পর্কে পৃথিবীর মেরুদণ্ড ঠিক সোজা ভাবে থাকে। তৃতীয় চিত্রটি হইতে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে।

তৃতীয় চিত্র।

অয়নমণ্ডলের খ প্রান্তে আসিয়া যে দিন

পৃথিবীর উত্তরাংশ সূর্য্যের অভিমুখে যত দূর যাইবার যায় সেই দিন দক্ষিণাংশ যতদূর বিমুখে ঝুঁকিবার ঝোঁকে সেই জন্য উত্তরাংশে এই দিনে দিবসের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা যেমন অধিক, দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা তেমনি অধিক হয়। ইহার পর দিন হইতে আবার উত্তরাংশ সূর্য্যের বিমুখে এবং দক্ষিণাংশ সূর্য্যের দিকে যাইতে আরম্ভ করে, সেই জন্য উত্তরাংশে অল্পে অল্পে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য কমিয়া কমিয়া দিন রাত্রি সমান হইতে আরম্ভ হয়, এবং তিন মাস পরে যখন পৃথিবী গ চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন একেবারে সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে, তাহাতে পৃথিবীর ঠিক অর্দ্ধ ভাগ সূর্য্যের অভিমুখী আর ঠিক অর্দ্ধভাগ বিমুখী হয়, সেই নিমিত্ত পৃথিবী এই স্থানে পৌছিলে এক দিন সমস্ত পৃথিবীময় অর্থাৎ পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত সমান দিন রাত্রি হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের বিমুখে ও দক্ষিণ মেরু তদভিমুখে ঘুরিয়া যায়। এই দিন হইতে উত্তর মেরুতে রাত্রি ও দক্ষিণ মেরুতে দিন আরম্ভ হইয়া ৬ মাস ধরিয়া এক মেরুতে আলোক ও এক মেরুতে অন্ধকার থাকে * এবং উত্তরাংশে উত্তরোত্তর রাত্রির

---

* এই জন্যই বোধ হয় পুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে আমাদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র।

ও দক্ষিণাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর তিন মাস পরে যখন পৃথিবী ক চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন উত্তরাংশ স্র্য্যের যতদূর বিমুখে এবং দক্ষিণাংশ যতদূর অভিমুখে যাইবার যায়। সেই জন্য এই দিনে উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়ে। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু আবার স্র্য্যের অভিমুখে ও দক্ষিণ মেরু স্র্য্যের বিমুখে যাইতে আরম্ভ করে, উত্তরাংশে আবার রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য কমিতে আরম্ভ করিয়া দিন রাত সমান হইতে থাকে। তিন মাস পরে পৃথিবী ঘ চিহ্নিত স্থানে আসিয়া আবার স্র্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত তখন আর এক দিন পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত সমান দিন রাত্রি হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু স্র্য্যের অভিমুখে পড়িয়া উত্তর মেরুতে দিবস ও দক্ষিণ মেরুতে রাত্রি আরম্ভ হয়। ৬ মাস ধরিয়া ২৪ ঘণ্টাই এক মেরুতে আলোক ও আর এক মেরুতে অন্ধকার থাকে। এবং উত্তরার্দ্ধে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণার্দ্ধে রাত্রির দৈর্ঘ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া তিন মাস পরে আবার পৃথিবী খ চিহ্নিত স্থানে আইসে। সেই দিন

সুমেরু অর্থাৎ উত্তর মেরু দেবতাদের বাস স্থান বলিয়া পুরাণে নির্দ্দিষ্ট।

উত্তরার্দ্ধ সূর্য্যাভিমুখে যত দূর ঝুঁকিবার এবং দক্ষিণার্দ্ধ সূর্য্যের যত দূর বিমুখে যাইবার যায় সেই জন্য উত্তরে দিবসের দৈর্ঘ্য এবং দক্ষিণে রাত্রির দৈর্ঘ্য সেই দিন সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া পর দিন হইতে আবার কমিতে থাকে।

এইরূপে পৃথিবীর সকল অংশে বৎসরে দুই দিন করিয়া সমান রাত্রি দিন (Equinox) হয়; একদিন ২২ মার্চ একদিন ২২ সেপ্টেম্বর। এবং দুই দিন করিয়া পৃথিবীর দুই অর্দ্ধ এক এক বার সূর্য্যের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁকে। এক দিন ২২ জুন ও এক দিন ২২ ডিসেম্বর। ২২ মার্চ পৃথিবীতে যে দিন সমরাত্র দিন হয় সেই দিন হইতে ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ জ্যোতিষিক নূতন বৎসর গণনা করেন। সেই বাসন্তিক সমরাত্র-দিনের পর হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে, ও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে সেই জন্য ২২ মার্চের পর হইতে উত্তরাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে। উত্তর মেরুতে ৬ মাসের জন্য দিন দক্ষিণ মেরুতে ৬ মাসের জন্য রাত্রি আরম্ভ হয়। তিন মাস পরে ২২ জুনে পৃথিবী অয়নমণ্ডলের খ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছিলে, উত্তর দিক সূর্য্যের দিকে ও দক্ষিণ দিক সূর্য্যের বিমুখে যত দূর যাইবার যায় সেই দিন উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে। সেই দিনকে উত্তরায়ন দিন (Summer solstice) কহে। সূর্য্যকে সেই দিন দৃশ্যতঃ

আমরা উত্তরের শেষ সীমায় দেখিতে পাই। সেই জন্য এই দিন হইতে আবার দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তরে দিন ও দক্ষিণে রাত্রি কমিয়া ক্রমে দিন রাত্রি সমান হইতে থাকে। পরে ২২ শে সেপ্টেম্বরে আবার পৃথিবীময় এক দিন সমান রাত্রি দিন হইয়া তাহার পর দিন হইতে উত্তর মেরুতে ৬ মাস অন্ধকার ও দক্ষিণ মেরুতে ৬ মাস আলোক হয় ও উত্তরে রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে। এবং ২২ শে ডিসেম্বরে আবার উত্তরার্দ্ধ যত দূর সূর্য্যের বিমুখে দক্ষিণার্দ্ধ তত দূর অভিমুখে ঝোঁকে সেই জন্য উত্তরাংশে এই দিবসে সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রি বড় ও দক্ষিণার্দ্ধে দিন বড় হয়। এই দিনের নাম দক্ষিণায়ন দিন (Winter Solstice) কেন না এই দিন আমরা সূর্য্যকে দক্ষিণের শেষ সীমায় দেখিতে পাই। এই দিন হইতে সূর্য্য আবার উত্তরে ফিরিতে আরম্ভ করে। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন দিনে আমাদের মনে হয় যেন সূর্য্য এক দিন করিয়া তাহার শেষ সীমায় থামিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিতেছে।

মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসের দুই সমরাত্রদিনে যখন পৃথিবী আপন কক্ষের গ ঘ বিন্দুতে গিয়া সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে তখন আমরা সূর্য্যকে ঠিক পূর্ব্বে উঠিতে দেখি এবং পৃথিবী যখন অয়নমণ্ডলের ক খ বিন্দুতে

যায় তখন সূর্য্যকে একবার আমরা দক্ষিণ সীমায় ও এক-বার উত্তর সীমায় দেখিতে পাই।

আমরা পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবীর গতি অনুভব করিতে পারি না। সেই জন্য সূর্য্যকেই ক্রমাগত সরিতে দেখি। এইরূপে দৃশ্যতঃ সূর্য্য যে পথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তাহাকে রাশিচক্র বলা যায়। এই রাশিচক্রের যে অংশ যে নক্ষত্ররাশির সম্মুখীন তাহা সেই নক্ষত্ররাশির নাম পাইয়াছে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই বার রাশিতে রাশিচক্র বিভক্ত। এই রাশিচক্রে সূর্য্যের গতি অনুসারে আর্য্যগণ বৎসর গণনা প্রণালী স্থির করিয়া গিয়াছেন। মেষরাশিতে উদয় হইয়া যথাক্রমে অপর ১১ রাশি অতি-ক্রম করিয়া পুনরায় সূর্য্যের মেষরাশিতে আসিতে যে সময় লাগে তাহাই আমাদের এক বৎসর। সূর্য্য এক এক রাশিতে এক এক মাস অবস্থিতি করে। ইয়োরোপের জ্যোতিষিক বৎসর গণনার প্রথা অন্যরূপ। পৃথিবীর বিষুবরেখা ও রাশিচক্রের যে দুই স্থান পরস্পর কর্ত্তন করে সেই দুই স্থানে সূর্য্য আসিলে সমরাত্রদিবা হয়। বাস-ন্তিক সমরাত্রদিবার সময় সূর্য্য যে স্থানে থাকে সেই স্থান হইতে ছাড়িয়া আবার সেই স্থানে আসিলে ইয়োরোপীয় জ্যোতিষিক বৎসর পূর্ণ হয়। ইয়োরোপীয় জ্যোতির্বেত্তারা অধুনা রাশি বিভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অপরাপর

বৃত্তের ন্যায় সূর্য্যের দৃশ্যতঃ বাৎসরিক গতির পথকেও তাঁহারা তিন শত যাট ভাগে বিভক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে ক্রমে আর একটি কথা বলিবার আবশ্যক আছে। পৃথিবীতে এক সম্বৎসরে যে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয় দিবারাত্রের দৈর্ঘ্য-বৈষম্যই তাহার কারণ। যদি চিরকাল পৃথিবীতে সমরাত্রদিবা থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই পৃথিবীতে একটি মাত্র ঋতু থাকিত। সূর্য্যোত্তাপবৈষম্যই ঋতুর প্রধান কারণ। পৃথিবীর যখন যে অংশে দিবসের দৈর্ঘ্য অধিক হয় সেই অংশ তত অধিক ক্ষণ ধরিয়া সূর্য্যের উত্তাপ পায়, অথচ রাত্রি ছোট বলিয়া সেই সঞ্চিত উত্তাপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়াও প্রতিনিক্ষেপ করিতে পারে না, কাজেই সেই অংশে তখন গ্রীষ্ম কাল উপস্থিত হয়। আবার যে অংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য অধিক সে অংশ দিবসে অল্প উত্তাপ পায়—এবং যাহাও পায় রাত্রি বড় বলিয়া সমস্তই নিক্ষেপ করিতে পারে। বসন্ত কালে ও শরৎকালে দিনরাত্রি অনেকটা সমান থাকে সে জন্য এই দুই সময় শীত গ্রীষ্ম কিছুরই প্রভাব থাকে না, দিবসে পৃথিবী যত উত্তাপ পায় সমান রাত্র বলিয়া তাহা নিক্ষেপ করিতে পারে। এইরূপে আমরা গ্রীষ্ম হইতে শরৎ, শরৎ হইতে শীত, শীত হইতে বসন্তে আসি। পৃথিবীতে যথার্থ পক্ষে

এই চারি ঋতুর প্রাদুর্ভাব। অপর দুই ঋতুর মধ্যে, বর্ষা গ্রীষ্মের অন্তর্গত ও হেমন্ত শীতের মধ্যবর্ত্তী। পৃথিবীর উত্তর কিম্বা দক্ষিণাংশ যখন সূর্য্যের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা ঝুঁকিয়া পড়ে—তখনি কি না দিবস কিম্বা রাত্রির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য এই সময়েই রাত্রি বৃদ্ধির সহিত শীতের ও দিবস বৃদ্ধির সহিত গ্রীষ্মের প্রভাব বাড়ে। দক্ষিণ কিম্বা উত্তর যতদূর সূর্য্যের অভিমুখে ও বিমুখে ঝুকিবার ঝুঁকিয়া যখন পরে আবার একটু একটু করিয়া সমান হইতে আরম্ভ হয়, তখন দিন রাত্রিও সমান হইতে আরম্ভ করে, সেই জন্য শীত গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী দুই সময়ে শরৎ ও বসন্ত কালে আমরা একটি সুখজনক ঋতু উপভোগ করি। পৃথিবীর কটিদেশে দিবারাত্রি সমান বলিয়া সেখানে ঋতুপ্রভেদ নাই। কিন্তু তাহা হইলে সেখানে চির বসন্ত না হইয়া অতিশয় গ্রীষ্ম কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যেখানে সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে সেই খানেই অধিক গ্রীষ্ম হয়। দুই প্রকারে আমরা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক পরিমাণে পাই, প্রথমতঃ রাত্রি অপেক্ষা দিবস বড় হইলে, দ্বিতীয়তঃ সূর্য্য ঠিক মাথার উপর দিয়া লম্ব ভাবে কিরণ প্রদান করিলে। ‡

‡ স্থানীয় বিশেষ কারণেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীতোষ্ণের প্রভেদ হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ। জলের গুণ এই, স্থলের ন্যায় তাহা-

সূর্য্য প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ঠিক আমাদের মস্তকের উপর দিয়া যখন কিরণ প্রদান করে তখন আমরা অধিক পরিমাণে গ্রীষ্ম বোধ করি। গ্রীষ্মকালে একে দিবস বড়, তাহাতে শীতকাল অপেক্ষা সূর্য্য আমাদের শিরোবিন্দুর নিকট থাকিয়া কিরণ দেয় সেই জন্য উত্তাপের এত প্রাখর্য্য হয়। শীতকালে একে দিবস ছোট তাহাতে সূর্য্য কৌণিক ভাবে পার্শ্ব দিয়া উত্তাপ দেয়, সেই জন্য সে উত্তাপ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হয় না।

বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে চিরকালি সূর্য্য ঠিক মাথার উপর হইতে কিরণ প্রদান করে—সেই জন্য দিন রাত্রি সমান হইলেও সেখানে উত্তাপের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য সমস্ত বৎসরেই সেখানে গ্রীষ্মকাল। পৃথিবীর মেরুদেশেও বিশেষ ঋতুপরিবর্ত্তন দেখা যায় না, বৎসরের মধ্যে সেখানে দুইবার মাত্র ঋতুপরিবর্ত্তন হয়। একবার শীত একবার গ্রীষ্ম। যে ছয় মাস করিয়া সেখানে রাত্রি সেই ছয় মাস সেখানে শীত এবং যে ছয় মাস সেখানে দিন সেই ছয় মাস সেখানে গ্রীষ্ম।

শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। যেমন আস্তে আস্তে জল উত্তপ্ত হয় তেমনি আস্তে আস্তে জল উত্তাপ প্রতিনিক্ষেপ করে। স্থলে যেমন দিন রাত্রিতে ও ঋতু বিশেষে উষ্ণতার বৈষম্য দেখা যায় উপরোক্ত কারণে দিন রাত্রিতে কিম্বা শীত গ্রীষ্মকালে জলের উত্তাপের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

পৃথিবী নিজ অয়নমণ্ডলে চিরকাল প্রায় সমান ভাবে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট করিয়া হেলিয়া আছে বলিয়া পৃথিবীর যে মেরু যখন সূর্য্যাভিমুখে ঝুকিতে আরম্ভ করে তখন সেই মেরু ঐ ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া আবার বিমুখে ফিরিতে থাকে। আবার সূর্য্য হইতে বিমুখে ঝুঁকিবার সময়ও ঐ ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া অভিমুখে ফিরিতে আরম্ভ করে এই জন্য একই সময়ে পৃথিবীর এক মেরুতে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট স্থান জুড়িয়া আলোক ও অপর মেরুতে ঐ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া অন্ধকার হয়। পৃথিবী এইরূপ হেলিয়া আছে বলিয়া দৃশ্যতঃ মনে হয় সূর্য্য বিষুবরেখার ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তরে গিয়া দক্ষিণে ফিরিতে আরম্ভ করে আবার দক্ষিণেও ঐ পরিমাণ গিয়া উত্তরে ফেরে। সূর্য্য কর্কটরাশি হইতে দক্ষিণে এবং মকররাশি পর্য্যন্ত গিয়া আবার উত্তরে ফিরিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর বিষুব-রেখার সমান্তরাল যে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে সূর্য্যায়ন মণ্ডলের উত্তরস্থ শেষ সীমা চিহ্নিত হয় তাহার নাম কর্কটরেখা ও দক্ষিণস্থ ঐ রূপ বৃত্তের নাম মকররেখা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পৃথিবীর অয়নমণ্ডলের সকল স্থান সূর্য্য হইতে সমান দূরস্থ নহে। অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে অধিক দূরবর্ত্তী পৃথিবী তাহার নিকট পৌঁছিলে এখন আমাদের উত্তরাংশে গ্রীষ্ম কাল হয়, অর্থাৎ সেই

সময় উত্তর ভাগ অধিক পরিমাণে সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, আর অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পৃথিবী আমাদের শীতকালে তাহার নিকট পৌঁছায়।

গ্রীষ্ম কালে আমরা সূর্য্যের নিকটে না থাকিয়া শীতেই নিকটে থাকি সে জন্য আমাদের একটু সুবিধা হয়। ইহার বিপরীত হইলে শীতকালে এখনকার অপেক্ষা অধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে এখনকার অপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম হইত। কিন্তু দক্ষিণাংশে আমাদের ঠিক বিপরীত। অয়নমণ্ডলের যে প্রান্ত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকট পৃথিবী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে দক্ষিণাংশে গ্রীষ্ম উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই সময় দক্ষিণ ভাগ অধিক পরিমাণে সূর্য্যাভিমুখী হয় এবং যখন দক্ষিণাংশে শীত উপস্থিত হয় তখন পৃথিবী আবার অয়নমণ্ডলের দূর বিন্দুর নিকটে থাকে। এই জন্য দক্ষিণাংশে শীতের সময় যেমন শীত, গ্রীষ্মের সময় তেমনি গ্রীষ্ম।

আহ্নিক ও বাৎসরিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আর দুইটি গতি আছে, তাহারা বিশেষ জটিল। একটি ক্রান্তিপাতের বক্র গতি (Precession of the Equinoxes) আর একটি মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন গতি, (Nutation)।

বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহাদের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভাব্য নহে; এ বিষয়ে যদি কাহারো কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তবে বিজ্ঞানের বিশেষ সাধনা না করিলে তাহা নিবারিত হইবার উপায় নাই।

পৃথিবীর বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগ-স্থলকে ক্রান্তিপাত কহে।

পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলে কৌণিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া ঘুরিবার সময় বিষুবরেখার দুইটি বিন্দু মাত্র প্রতি দিন কক্ষকে ছুঁইতেছে। কিন্তু সেই একই বিন্দুদ্বয় চিরকাল কক্ষের উপর পড়িতেছে না। প্রতি বৎসর ক্রান্তিপাত ৫০ সেকেণ্ডের কিছু অধিক পূর্ব্বে পড়িতেছে, অর্থাৎ আজ বিষুবরেখার যে বিন্দু কক্ষের উপর পড়িতেছে, আগামী বৎসর এই দিবসে সেই বিন্দু হইতে ৫০ সেকেণ্ড পূর্ব্বেস্থিত বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করিতেছে। এইরূপে ২৫৮৬৮ বৎসরে আবার সেই একই বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতি পৃথিবীর দুই স্বতন্ত্র গতির কার্য্যফল। পৃথিবীর মেরু দেশ অপেক্ষা বিষুবরেখার পদার্থ সমষ্টি অধিক, সুতরাং মেরুদেশে চন্দ্র সূর্য্যের যেরূপ আকর্ষণ প্রভাব বিষুবরেখায় সে রূপ নহে; এই আকর্ষণ বৈষম্য-বশতঃ ক্রান্তিপাত ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কেবল এই কারণে ক্রান্তিপাতের যে পরিমাণ বক্রগতি হইবার কথা আর একটি কারণে তাহা অপেক্ষা অল্প হয়। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা যেমন ক্রমেই ক্রান্তিপাতের বক্র গতি হইতেছে, তেমনি গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর আর একটি অগ্র গতি উৎপন্ন হইতেছে এই উভয় গতির কার্য্য ফলে বৎসরে ক্রান্তিপাত কিছু অধিক ৫০

সেকেণ্ড পিছাইয়া যাইতেছে অর্থাৎ ৫০ সেকেণ্ড অগ্রে সম্পন্ন হইতেছে।

এই গতির দ্বারা আমরা দুই তিনটি ঘটনা দেখিতে পাই।

প্রথম, বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দু, যতই সরিতে থাকে ততই পৃথিবীর মেরু চক্রাকার পথে ঘুরিয়া যায়।

পৃথিবীর মেরু যে চক্রাকার পথে ঘুরিয়া যায় তাহার কেন্দ্র পৃথিবীর কক্ষের মেরু। সুতরাং ২৫৮৬৮ বৎসরে এই কেন্দ্রের চারিদিকে পৃথিবীর মেরু এক একটি বৃত্ত অঙ্কিত করে।

এই গতির দ্বারা মেরুবর্ত্তী নক্ষত্র রাশির সুদীর্ঘ কালে স্থান পরিবর্ত্তন হয়, এই কারণে ধ্রুব নক্ষত্র সর্ব্বদা এক থাকে না।

দ্বিতীয়, যতই বিষুবরেখার এক একটি বিন্দু সরিয়া তাহার পূর্ব্বোস্থিত বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়িতে থাকে, ততই সূর্য্যের নক্ষত্র রাশিতে উদয় কাল প্রভেদ হইয়া পড়ে, এবং ঋতুর বৈষম্য উপস্থিত হয়। তাহা কিরূপে হয় দেখা যাউক। একটি নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে নাক্ষত্র (Sideral) বৎসর বলে। আমাদের পঞ্জিকায় যে বৎসর গণনা থাকে তাহা নাক্ষত্র বৎসর। কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয় স্থান হইতে সূর্য্য পুনর্ব্বার কৃত্তিকায় দৃশ্যত ফিরিয়া আসিলে

এখন একটি বৎসর পূর্ণ হয়। ইহাই যথার্থ বৎসর; একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে এই বৎসর পূর্ণ হয়।

এক ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ক্রান্তি পাতে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে এক সৌর বৎসর (Tropical) বলা যায়। সৌর বৎসর নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা বিশ মিনিট বিশ সেকেণ্ড অল্প সময়ে পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিষুবরেখার একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইতেছে না, হটিয়া হটিয়া বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দুই পর্য্যায় ক্রমে পৃথিবীর কক্ষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতির পরিমাণ ৫০. ২২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবীর যে দিকে গতি হইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে ক্রান্তিপাত বিষুবরেখার ৫০. ২২ সেকেণ্ড পরিমাণ স্থান সরিয়া যাইতেছে। সুতরাং একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইলে পৃথিবীকে যতদূর ভ্রমণ করিয়া আবার ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইতে হইত, তাহা অপেক্ষা অল্প দূর ভ্রমণ করিয়াই পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে সমরাত্র-দিন হয় সেই জন্য বাসন্তিক সমরাত্র-দিন হইতে সৌর বৎসরের আরম্ভ।

সৌর বৎসরের উপর যে ঋতুর পরিবর্ত্তন নির্ভর করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি প্রতি বৎসরে ঋতু উৎ-

পাদক সৌর বৎসর নাক্ষত্র বৎসর হইতে ২০ মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড হ্রাস হইতে থাকে অর্থাৎ ২০ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অগ্রে হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমাণে প্রত্যেক ঋতুও প্রতি বৎসরে নাক্ষত্র বৎসরের অগ্রে সম্পন্ন হইবে। এবং এই প্রকারে ২৫৮৬৮ বৎসর পরে আবার নাক্ষত্র ও সৌর নূতন বৎসর ঠিক একই সময়ে আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ আজ নাক্ষত্র বৎসরের যে মাসে যে দিনে যে মুহূর্ত্তে সমরাত্রদিবা হইতেছে আবার ২৫৮৬৮ বৎসর পরে ঠিক সেই সময়ে সমরাত্রদিবা হইবে। হিন্দুরা নাক্ষত্র এবং ইয়োরোপীয়গণ সৌর বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় গণনায় যে মাসে যে ঋতু তাহা চিরকাল একই প্রকার থাকিবে, কিন্তু আর্য্যদের নাক্ষত্র বৎসর গণনায় প্রতি বৎসরে সমরাত্রদিবা ২০ মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড অগ্রে হওয়াতে ক্রমশ অনেক বৎসরে অল্পে অল্পে ঋতুর সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যে মাসে বসন্ত ছিল সে মাসে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের সময় বর্ষা এইরূপে পৃথিবীর দুই অর্দ্ধে ঋতুর সময়ের একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথমদিনে যখন বাসন্তিক সমরাত্রদিন হইত তখন সেই দিন হইতে আর্য্যগণ নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ১০ চৈত্র সমরাত্র-দিবা আরম্ভ হইয়াছে, পুনরায় বৈশাখ মাসের প্রথমে সমরাত্রদিবা হইতে প্রায় ২৫০০০ বৎসর লাগিবে। পূর্ব্বে বাসন্তিক সমরাত্রদিবায় সূর্য্য মেষ

রাশিতে উদয় হইত, এখন ঐ দিন মীনরাশি অতিক্রম করিতেও সূর্য্যের ১০ ডিগ্রি বাকি থাকে। এই রূপে ক্রমেই সূর্য্য পিছাইয়া উদয় হইতে হইতে ২৫৮৬৮ বৎসরে সেই একই নক্ষত্রে উদয় হইবে।

ক্রান্তিপাত সচল বলিয়া পৃথিবী যেরূপ আবার ক্রমে বেঁকিয়া বেঁকিয়া চলিতেছে, অর্থাৎ তাহার ইহাতে যেরূপ একটি মৃদুগতি হইতেছে, তাহা দ্বারা অয়নমণ্ডল ক্রমশই আবার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই কক্ষ পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা পৃথিবীর আর যে একটি বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে সৌরব্যবধান বৎসর (anomalistic year) নামে উল্লেখ করা গেল। পৃথিবীর কক্ষের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলে এই বৎসর পূর্ণ হয়। কক্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া এই বিন্দুটি যদি অচল থাকিত তাহা হইলে সৌর ব্যবধান ও নাক্ষত্র বৎসরের পরিমাণ সমান হইত।

কিন্তু পৃথিবী এমন একটি মৃদু গতিতে তাহার অয়ন-মণ্ডল পরিবর্ত্তন করে যে এই হেতু পৃথিবীর কক্ষের এক॰ অবস্থা হইতে পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে ১০৮০০০ এক লক্ষ আট হাজার বৎসর লাগে।
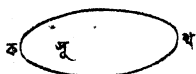
চতুর্থ চিত্র।

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, পৃথিবী অয়নমণ্ডলের ক বিন্দুতে আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে ও খ বিন্দুতে আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরে পড়ে কিন্তু পৃথিবীর কক্ষ-পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা ৫৪০০০ বৎসরে অয়নমণ্ডলটি সম্পূর্ণ রূপে ঘুরিয়া গিয়া খ বিন্দুটি সূর্য্যের নিকটে ও ক বিন্দুটি সূর্য্য হইতে দূরে পড়িবে. এবং আবার ৫৪০০০ হাজার বৎসরে ক বিন্দু সূর্য্যের নিকটস্থ হইয়া খ বিন্দু দূরে যাইবে। এই রূপে ১০৮০০০ বৎসরে পৃথিবীর কক্ষ এক অবস্থা হইতে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তাহা কিরূপে হয় এইবার দেখা যাউক। উপরে পৃথিবীর কক্ষ যেরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে পৃথিবী স্থির সূর্য্যের চারিদিকে ঐরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ সরিয়া ভিন্ন পথে চলে, ইহাতে তাহার কক্ষের আকৃতি ক্রমশঃ পঞ্চম চিত্রের ন্যায় হইয়া পড়ে,
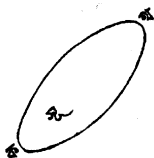
পঞ্চম চিত্র।　　ষষ্ঠ চিত্র।
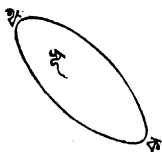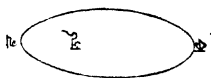
সপ্তম চিত্র।　　অষ্টম চিত্র।

আবার কিছু দিন পরে ষষ্ঠ চিত্রের ন্যায় আরো কিছু দিন পরে সপ্তম চিত্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ৫৪০০০হাজার বৎসরে আবার অষ্টম চিত্রের মত হইয়া দাঁড়ায়। এক সময়ে অয়নমণ্ডলের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে ছিল তাহা দূরে গিয়া দূরের অংশ নিকট আসে।

কক্ষের এইরূপ পরিবর্ত্তন হেতু এক বৎসর পূর্ব্বে কক্ষের যে বিন্দুতে আসিলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইত, সেই বিন্দু পর বৎসরে আরো

১২ সৈকেণ্ড অগ্রসর হইলে তবে আবার পূর্ব্বের মত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় সুতরাং সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীর আবার ১২ সেকেণ্ড অধিক সময় লাগে। এই-হেতু সৌর ব্যবধান বৎসরের পরিমাণ নাক্ষত্র বৎসর হইতে প্রায় ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক, অর্থাৎ সূর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর ব্যবধান সমান হইতে প্রতি বৎসরে ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক সময় লাগে। *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যের দূরত্ব সম্পর্কে এক অবস্থায় আসিতে পৃথিবীর কক্ষের ১০৮০০০ হাজার বৎসর লাগে, কিন্তু ঋতু সম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব পরিমাণ এক হইতে, ২০০০০ বৎসর লাগে। ঋতু উৎপাদক সৌর বৎসর এবং সৌর ব্যবধান বৎসরের মধ্যে পরস্পর বৃত্তাভাষের ব্যবধান ৬১.৯ সেকেণ্ড; এই দুই বৎসরের এক অবস্থায় অবস্থিত হইতে ২০০০০ বৎসর লাগে, এবং ইহার উপরই ঋতু সম্পর্কে সূর্য্য-দূরত্বের পরিবর্ত্তন সময় নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আজ কাল শীত কালে জানুয়ারি মাসে, সূর্য্য দূরত্ব পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আবার কুড়ি হাজার বৎসর

---

* পৃথিবীর কক্ষ পরিবর্ত্তন গতির সম্যক আলোচনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার উপর একটী অতি গুরুতর নৈসর্গিক ঘটনা নির্ভর করে। পরবর্ত্তী অন্যতম প্রস্তাবে যে হিম-শৈল যুগের বর্ণনা হইয়াছে পৃথিবীর এই গতিই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

পরে সূর্য্য দূরত্ব এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে, পৃথিবী কক্ষের নিকট প্রান্তে আসিবে—কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক ১০০০০ হাজার বৎসরে আবার জানুয়ারী মাসে শীতকালে সূর্য্য পৃথিবী হইতে অধিক দূরে থাকিবে। তখন দক্ষিণার্দ্ধে শীত গ্রীষ্মের লাঘব হইয়া উত্তরার্দ্ধেই এতদুভয়ের প্রাদুর্ভাব হইবে।

পৃথিবীর মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন গতি প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ-সম্ভূত। কিন্তু গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই গতি অনেকটা ডোঙ্গা কলের ন্যায়, এক মেরু যখন ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে—আর এক মেরু তখন নিম্নে নামিতে থাকে। পৃথিবীর মেরু দ্বয়ের যদিও চিরকাল উত্তর দক্ষিণে লক্ষ্য বদ্ধ তথাপি চন্দ্রের আকর্ষণে উত্তর মেরুর উত্তর আকাশে দক্ষিণ মেরুর দক্ষিণ আকাশে উপরোক্ত রূপ ঊর্দ্ধ নিম্নগামী একটি গতি হয়। এক মেরু যখন আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে আর এক মেরু তখন ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে থাকে। *

---

* সি স' (see saw) নামে বালক বালিকাদিগের খেলিবার ইংরাজি একরূপ দোলনা আছে তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই গতিটি বুঝিতে পারিবেন। 'সেই দোলনায় দুই দিকে দুই জন বালক বসিয়া থাকে এক দিকের বালক যখন ঊর্দ্ধে উঠে আর এক দিকের বালক তখন নীচে নামে।

এখন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর মেরুর চক্রাকার গতির সঙ্গে সঙ্গে উভয় মেরুতে পূর্ব্বোক্ত রূপ আর একটি গতি হইলে উভয় মেরুই আকাশে বিসর্পিত চিহ্ন সমষ্টি অঙ্কিত করিবে।

১৯ বৎসর পরে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর এক অবস্থা হয় সেই জন্যই এই রূপ এক একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিতে ১৯ বৎসর লাগে—অর্থাৎ এক মেরুর নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আবার সেই নিম্নের স্থানটিতে আসিতে ১৯ বৎসর লাগে।

সৌর পরিবারবর্ত্তী পৃথিবী উপরি উক্ত গতি-প্রণালীতে অনন্ত আকাশ-পথে চক্রের উপর চক্র কাটিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে ছুটিয়া এবং আপন মেরুদণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যসহ পুষ্যা নামক (Hercules) নক্ষত্রের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়।

"না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারি
ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল
জয় জয় মহিমা তোমারি।"

এই চিন্তা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব উত্তেজিত হইয়া উঠে. এ চিন্তা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সৌর-জগৎ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ বিষয় চিন্তা করিবার সময় কেবলমাত্র উপরোক্ত বাক্য কয়েকটি অন্ধ-ভাবে হৃদয়স্থ করিয়াই যে আমাদের উদ্দীপিত কৌতূহল নিবারিত হয়, তাহাও নহে, আমরা সাধ্যমত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং উৎপত্তির প্রণালী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, সেই জন্য পৃথিবীর উৎপত্তির তথ্য জানিতেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মন উৎসুক। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহ-বিশিষ্ট সৌর জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ, যে

একটির উৎপত্তির বিষয় জানিতে গেলেই, সমস্ত গুলির বিষয় সেই সঙ্গে জানিতে হয়।

সৌর জগৎ একটি বৃক্ষ স্বরূপ, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তাহার শাখা প্রশাখা। কোন একটি শাখার উৎপত্তির বিষয় ভাবিতে গেলেই, যেমন সর্ব্বাগ্রে বৃক্ষটির বিষয় ভাবিতে হইবে তেমনি কোন একটি গ্রহের উৎপত্তি দেখিতে গেলেই সৌর জগতের উৎপত্তি আগে দেখা আবশ্যক। সৌর জগতের উৎপত্তি দেখিলেই পৃথিবীর উৎপত্তি আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব।

অতি পুরাতন কাল হইতে প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী পাওয়া যায়। দুই এক জাতির কিম্বদন্তীতে সত্যের ছায়াও লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সত্যের ছায়া যে কি তাহা এস্থানে আলোচনা করা বাহুল্য, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর তত্ত্বানুসন্ধানের ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে কল্পনার মানস-সম্ভূত কন্যা।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এবিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট প্রথমে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন।

এই যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গ্রহ এবং নয়টি উপগ্রহ * চক্রাকারে আকাশে একই সমতল পথে ঘুরিতেছে ইহা কি কেবল একটি মাত্র দৈব ঘটনা হইতে উৎপন্ন, কিম্বা কোন অবিদিত নিয়মের ক্রিয়াফল ? কাণ্ট ভাবিলেন, এতগুলি জ্যোতিষ্কের এরূপ একই পথে গতি কখনও দৈবাৎ হইতে পারে না, অবশ্য কোন এক সাধারণ-নিয়ম-বলে এই সমস্ত সৌর জগৎ একই পথে প্রধাবিত।

কিন্তু এমন কোন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সমস্ত গ্রহগুলির উপর খাটান যাইতে পারে তাহা কি ?

কোন পদার্থ দ্বারা জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে তাহারা এইরূপ সমসূত্রে চালিত হইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে শূন্যে ঘুরিতেছে। গ্রহগণ যে ইথারময় আকাশে ঘোরে, সে ইথার এত সূক্ষ্ম যে তাহা পদার্থ নামের বাচ্য হইতে পারে না। তবে কোন পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত না হইয়া গ্রহগুলির এ প্রকার আশ্চর্য্যজনক এক রূপ গতি হয় কেন ? কাণ্ট অনুমান করিলেন, প্রথমে সৌর জগতের সমস্ত স্থান কেবল আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জলন্ত বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল এবং সেই পদার্থরাশির কোন কোন স্থান অপেক্ষা

* এই কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ মাত্র তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কোন কোন স্থান ঘন থাকায় ক্রমে মাধ্যাকর্ষণ-বলে সেই বাষ্প-জগতের লঘু অংশ, ঘন স্থানগুলির বাষ্পের সহিত মিলিয়া এক একটি গোলক রূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে সকল বস্তুই সকল বস্তুকে টানে এবং মাধ্যাকর্ষণ-বলেই ঘন পদার্থ লঘু পদার্থকে টানিয়া আত্মসাৎ করে। কিন্তু কাণ্টের অনুমানের একটি এই বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে—যদি বিশৃঙ্খল পদার্থরাশি, ঘন স্থান গুলিকে কেন্দ্র করিয়া গোলক হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক না হইয়া একটিমাত্র গোলক হইবার কথা। কেন না সেই বিস্তৃত বাষ্পরাশির যে কয়েক স্থান অধিক ঘন ছিল, সেই স্থানে চারি দিকের লঘু বাষ্প মিশিতে গিয়া প্রথমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক হইতে আরম্ভ হইলেও মাধ্যাকর্ষণ ও যন্ত্র বিদ্যার নিয়মানুসারে পরে সেই গুলি আবার একটি সাধারণ কেন্দ্রে আসিয়া একটি বৃহৎ গোলকরূপ ধারণ করিবে,—অর্থাৎ ঐরূপে মিশিবার সময় যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা আবার ঘন হইবে, তাহার আকর্ষণ দ্বারা কম ঘন স্থানগুলি তাহাতে মিশিয়া আবার একটিমাত্র গোলক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এতগুলি গোলক তবে কি করিয়া হইল? এ সমস্যা সম্বন্ধে কাণ্ট কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া ছোট গোলক গুলি বড় গোলকের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার

পথে ঘুরিবার তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক নহে।

সর উইলিয়াম হারসেল যদিও অন্য যুক্তি দেখাইয়া বলেন, নীহারিকারাশি হইতে জগৎ অভিব্যক্ত, কিন্তু তিনি সৌর জগতের গতি দেখিয়া তাহা বলেন না। দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশির (Nebula) পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মনে হয় ক্রমে গাঢ় অংশের আকর্ষণে লঘু অংশ মিশিয়া এক একটি গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এত বহু সংখ্যক নীহার রাশি আবিষ্কৃত করেন যে তাহা হইতে তিনি এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। যে হীনপ্রভ বিশাল বিস্তৃত বাষ্পরাশি এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় নাই, আবার তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট যে বাষ্পরাশির মধ্যভাগ এতদূর জমাট বাঁধিয়াছে, যে শীঘ্রই একটি জ্যোতিষ্ক হইবে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও যাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছে—এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পগণও দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে জ্বলন্ত নীহারিকা রাশি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত। এবং আকাশে যে সকল নীহারিকা এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ক্রমে এক একটি জ্যোতিষ্করূপে পরিণত হইবে বলিয়া তাঁহার মনে

হয়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীণ পরীক্ষা দ্বারা হারশেলের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

লাপ্লাস আবার সৌরজগতের গতির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন যে, যে আকাশে এখন গ্রহ উপগ্রহ সকল অবস্থিত তাহা এক সময় কেবল মাত্র জ্বলন্ত বাষ্প রাশি দ্বারা পূর্ণ ছিল। কান্টের ন্যায় লাপ্লাস কল্পনা করেন না যে, সর্ব্বাগ্রে আকাশমণ্ডল বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা হইতে সৌরজগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে সৌর জগতের আদিম অবস্থায় বিশাল, জ্বলন্ত, গোলাকার বাষ্পরাশি আকাশে ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশি একটি আবর্ত্তন-শলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত। ক্রমে ক্রমে এই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে সকল ঘূর্ণমান পদার্থেরি গতির বেগ বৃদ্ধি হইয়া তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি বাড়ায়। ঘূর্ণমান গোলকের কটীদেশের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুতরাং তথাকার কেন্দ্রাতিগ শক্তিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একটা ঘূর্ণমান গোলকের প্রত্যেক অংশের কেন্দ্রাতিগ শক্তি এবং সেই প্রত্যেক অংশের উপর তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত সমান থাকে ততদিন সেই গোলকের প্রত্যেক অংশ পূর্ব্ববৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিতে থাকে,

কিন্তু যখন কোন অংশের কেন্দ্রাতিগ শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সে গোলক মূল গোলক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যাহারা কুম্ভকারের চক্র দেখিয়াছেন তাহারা ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ পান। ঘূর্ণমান কুলালচক্র হইতে সতত বেগে মৃত্তিকা খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যদি মৃত্তিকা বাষ্পের গুণবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে উক্ত বিচ্ছিন্ন মৃত্তিকা অঙ্গুরীয়কাকৃতি ধারণ করিত, এবং বাতাস প্রভৃতি বস্তুর বাধা না থাকিলে উহা মূল মৃত্তিকা পিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে ঘুরিত। এইরূপে ক্রমে এই বাষ্পীয় গোলকের কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি হেতু বিষুবরেখা সন্নিহিত স্থল কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়কাকার চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ ঐ অতি বিস্তৃত বাষ্প রাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর গোলকে পরিণত হইল। সেই মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য।

এক একটি স্বতন্ত্র চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্রগুলি এক একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিল। (১) পূর্ব্বোক্ত

(১) আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন একটি চক্র না ভাঙ্গিয়া অখণ্ড ভাবে একটি গোলকরূপে

রূপে পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারা উপগ্রহ। যদি এমন হয় যে কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেই হেতু আকর্ষণ সমান তাহা হইলে তাহার পদার্থরাশি একস্থানে আসিয়া জমিতে না পাইয়া গোলক-রূপে পরিণত হইতে পারে না, হয় তাহা চক্রাকারেই গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, যেমন শনিগ্রহের চক্র, নয় সে চক্র হইতে খসিয়া ছোট ছোট গ্রহমালা সৃষ্ট হয়।

লাপ্লাসের এই বিখ্যাত মতটি লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতে এত হুল স্থূল। এই মত অনুসারে সৌর জগতের সূর্য্যই আদিম জ্যোতিষ্ক। অন্য জ্যোতিষ্ক গুলি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের এই মতের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু স্থূলতঃ ইহা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে সমাদৃত। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এই মতটিই জগতের

পরিণত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন কালক্রমে অঙ্গুরীয়কাকার চক্রের ক্ষীণ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক খণ্ড হইল কিন্তু সকল খণ্ড সমান ভারবিশিষ্ট এবং সমান দূরস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের অধিক সংখ্যক একত্রে মিশিয়া এক একটি বৃহৎ গোলকে পরিণত হইয়াছে।

দৃশ্যমান অবস্থার অধিকাংশ বিষয়ের কারণ দর্শাইতে সক্ষম। জগতের আদিম অবস্থা কল্পনা করিয়া অবরোহ প্রণালীতে লাপ্লাস যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, আরোহ প্রণালী অবলম্বন দ্বারা আধুনিক পণ্ডিত সার উইলিয়ম টমসন ও হেলম্‌হলট্‌স্‌, সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

এই পৃথিবীর উপরে যে সকল কাজ হইতেছে সকল কার্য্যেই সূর্য্যের উত্তাপ ব্যয়িত হয়। কি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া, আর কি একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হওয়া, সকলি সূর্য্য-উত্তাপ দ্বারা সম্পাদিত। এক দিন সূর্য্য হইতে উত্তাপ না আসিলেই পৃথিবীর সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই যে পৃথিবীর জীবন-রক্ষণকারী উত্তাপ, যাহা আমাদের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া মনে হয় তাহা সূর্য্যের হিসাবে অতি সমান্য। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১,৭০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীরিত করিতেছে।

কিছুকাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে, এইরূপ উত্তাপ বিক্ষেপ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপের ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; যে হেতু শক্তির ক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি মূল সত্য এই যে, আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয় না— শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র।

তাহা হইলে সূর্য্য সেই আদিম কাল হইতে উত্তাপ

রূপে যতটা শক্তি ব্যয় করিতেছে, সেই শক্তি আবার ত অমনি আপনা হইতে জন্মাইতে পারে না, তবে কেমন করিয়া সে ক্ষতিপূরণ হইয়া সূর্য্যে উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে? আমাদের পৃথিবীতে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশই যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক সূর্য্যেরও ত সেইরূপ কিছু চাই এবং গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়াও থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে।

সূর্য্য যে পরিমাণ উত্তাপ বিক্ষেপ করে তাহা সমভাবে রক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক ১০০ শত বৎসরে পৃথিবীর মত একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ তাহার উপর পড়া চাই, তাহা হইলেই তাহার ১০০ বৎসরের উত্তাপ জমা থাকে, কিন্তু তাহা যেকালে পড়ে না, তবে কোথা হইতে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা হইতেছে।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া ক্রমশঃ যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই তাহা হইতে আবার নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে শুনিলেই হঠাৎ কেমন

ধাঁধা লাগে। কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন বস্তু যতই শীতল হইতে থাকে ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়, এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে শীঘ্র শীতল হয় বটে কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুস্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে—কোন বাষ্পীয় পদার্থে এই নিয়মটি বিশেষ রূপে খাটে—এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য একেবারে শীতল হইয়া যতদিন ঘন অর্থাৎ তরল না হইবে, ততদিন এই নিয়মানুসারে সে উত্তাপ দিবে, ঘন হইয়া গেলে এ নিয়ম তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে আর খাটিবে না। এইরূপে উত্তাপ বিক্ষেপ দ্বারা সূর্য্য যে উত্তাপ হারাইতেছে, আবার নূতন সঙ্কোচনের দ্বারা সে ক্ষয় পূরণ হইতেছে। উত্তাপ রক্ষণের এই মতটি যে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুযায়ী তাহা নহে, অঙ্ক গণনা দ্বারাও ইহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়।

সূর্য্য কত উত্তাপ-শক্তি ব্যয় করে, তাহা বিদিত বলিয়া সমভাবে উত্তাপ রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর সূর্য্যের কতটুকু সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্য-ব্যাস সঙ্কুচিত হইলেই এখনকার উত্তাপ-পরিমাণ রক্ষিত হইবে। এই নিয়মানুসারে সূর্য্য ২৫ বৎসরে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যত দিন

সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে ততদিন শীতলতা-প্রবণ সূর্য্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপ-শক্তি সমভাবে রক্ষা করিবে। আমরা সূর্য্যের যত উত্তাপ পাই সর্ব্ব শুদ্ধ এখন সূর্য্য তাহার ২২৭০০০০০০০০ গুণ উত্তাপ বৎসরে বিকীর্ণ করে, এবং সূর্য্য আদিম কাল হইতেই এইরূপ সম পরিমাণ উত্তাপ দিতেছে এই স্থির করিয়া দেখা যায়, এই সম পরিমাণ উত্তাপ দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কুচিত হয়। এই সকল জানিয়া গণনা দ্বারা অতীত কালের সূর্য্যব্যাস স্থির করা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। এই নিয়মানুসারে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য ৪ মাইল বড় ছিল, দুশ বৎসরে ৮ মাইল, এই রূপে এক সময়ে সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা! এইরূপে আরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়াও আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরিশেষে লাপ্লাসের কল্পিত জগৎব্যাপী সূর্য্যের বাষ্পাবরণেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সূর্য্য-পরিত্যক্ত বাষ্পীয়-চক্র ক্রমে একটী গোলক রূপ ধারণ করিয়া পরে কিরূপে গ্রহ হইয়া দাঁড়ায় এই বার দেখা যাউক। সেই বাষ্পময় গোলকটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইয়া ঘন অর্থাৎ তরল হইতে থাকে। তরল গোলক ঘুরিলে যন্ত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে

তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায়, এবং তাহার বিষুব-রেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে। গোলকের আবর্ত্তনকালে তাহার সকল অংশ একই সময়ে একবার ঘুরিয়া আইসে; মেরুর নিকটস্থ স্থান যে সময়ে একটা ক্ষুদ্র রেখাকে বেষ্টন করে সেই সময়ের মধ্যে বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থান একটা বৃহৎ রেখাকে আবর্ত্তন করে। যদি দুই বস্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটি রেখাকে একই সময়ে আবর্ত্তন করে তবে বৃহৎ রেখা আবর্ত্তক বস্তুটি যে অধিক দ্রুতগামী তাহার সন্দেহ নাই। এক কথায় মেরুসন্নিহিত স্থান অপেক্ষা কোটিসন্নিহিত স্থানের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া তাহা কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং উভয় মেরু বিষু-বরেখা-অভিমুখে দমিয়া দুই দিক চাপা হইয়া পড়ে।

সূর্য্য-পরিত্যক্ত একটি বাষ্প-চক্র এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর গোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ অবলম্বন করিয়া নিউটন পৃথিবীর বিষুবরেখাস্থ প্রদে-শের উন্নতি এবং মেরুসন্নিহিত প্রদেশের অবনতির যে পরিমাণ স্থির করেন, পরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, মাপিয়া তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বৈজ্ঞানিক-সভা কর্তৃক ক্লেইরো, কামু, লেমনিয়ে, লাপ্লাণ্ড দেশে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহারা আবি-উটিয়ে ও শেলস্যৃসের সহিত একত্রে যখন পৃথিবীর একটি বৃত্তাংশ

(Arc) মাপেন তখন সেই এক সময়েই বুগে ও কঁদামিন দক্ষিণ আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ স্থির করেন। এই দুইটি পরিমাণ অবলম্বন দ্বারা অঙ্ক গণনা করিয়া নিউটনের গণনার ফল নির্ভুল বলিয়া স্থির হয়।

পৃথিবীর মেরুদ্বয় চাপা ও কটিদেশ স্ফীত বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয় বলা যায় পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল, কেননা একটা কঠিন বস্তু (যেমন প্রস্তর ইত্যাদি) চিরকাল ঘুরিলেও তাহার কোন স্থান চাপা কোন স্থান স্ফীত হইবে না কিন্তু তরল পদার্থ-নির্ম্মিত গোলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘুরিলে তাহার উপর ও নিম্ন দিক হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল এমন নহে, কতকটা সেই অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল, এবং তাহার কতকাংশ এখনো পৃথিবীর উপরে রহিয়াছে, তবে যে সময়কার কথা হইতেছে সে সময়ে এখনকার অপেক্ষা যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সে বাষ্প বিস্তৃত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০ সেনটিগ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে ১০০ ডিগ্রি উত্তাপই জীব জন্তুর প্রাণনাশক, ২০০০ হাজার

ডিগ্রি উত্তাপের ফল কি ভয়ানক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য এবং অপর যে সকল বস্তু এই ভয়ানক উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া যায় তাহারা তখন বাষ্পীয় অবস্থায় পৃথিবীর উপরে ভাসিতে লাগিল।

এই ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড্ উত্তাপ লইয়া তরল পৃথিবী শীতল আকাশ-পথে ঘুরিতে লাগিল। যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, সেখানকার উত্তাপ অতি অল্প। লাপ্লাসের মতে সেখানে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রির নীচের এক-শত ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ থাকে না। এই শীতল আকাশ সংস্পর্শে আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে পৃথিবীর উত্তাপ অনেক কমিতে লাগিল, এবং শীতলতা বশতঃ ভূপৃ-ষ্ঠের তরল পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া চটচটে হইতে লাগিল। আর একটি কথা এই, তরল পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা চলিতে লাগিল, জোয়ার ভাঁটার সাহায্যেও পৃথিবীর শীতল হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। কোন তরল বস্তুকে নাড়িয়া দিলে সে উত্তাপ ফেলিয়া দিয়া শীঘ্রই শীতল হয়, জোয়ার ভাঁটার কার্য্যগুণে পৃথিবীর সকল অংশই এক একবার উপরিভাগে উঠিয়া শীঘ্র শীতল হইতে লাগিল। এইরূপে সময়ে পৃথিবী যখন কিছু শীতল হইল তখন মেরু-সন্নিহিত সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের ন্যায়, অর্দ্ধ তরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থ রাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে

ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এইরূপ জমাট পদার্থ রাশিতে আবৃত হইয়া তাহার উপরের দিব্য এক আবরণ সৃষ্ট হইল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম আবরণে আভ্যন্তরিক জোয়ার ভাঁটা রোধ করা অসম্ভব, সুতরাং সেই আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তরল পদার্থরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখনকার পৃথিবীর অবস্থা—সেই উত্তপ্ত পদার্থরাশির ভীষণ বলে কম্পমান পৃথিবীর সেই ভীষণ অবস্থা—বর্ণনা অসম্ভব। সেই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ রাশি ক্রমে শীতল হইয়া পর্ব্বত শ্রেণীরূপ ধারণ করিল।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণীসমাকীর্ণ, বাষ্পরাশি আবৃত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে একবিন্দু জল নাই। পৃথিবীর উত্তাপ যখন আরো হ্রাস হইল, যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইল। তখন সেই বাষ্পরাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল। পৃথিবীর উপর প্রথম বৃষ্টিপতন এক নূতন যুগের আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহা আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতলাকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পড়িল। জলের এইরূপ ঘন ঘন অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনিতে ও বিদ্যুতালোকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী তোলপাড় হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভীষণ কোলাহলময় ভৌতিক যুদ্ধ যে কতদিন চলিল তাহার স্থিরতা নাই, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় যে জলই শেষে বিজয়ী হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। এইরূপে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিলে, সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া সদর্পে দুএকটি সূর্য্যকর দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই জলপ্লাবিত পৃথিবী সূর্য্যালোক প্রভাবে এখনকার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

ভূ-পঞ্জর।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম প্রস্তাব।

সূর্য্য হইতে খসিয়া ক্রমে পৃথিবীর বাষ্পচক্র কিরূপে একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া পরে আবার তাহা উষ্ণ সমুদ্রে মগ্ন হইল, তাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি, পরে সেই আদিম মহাসমুদ্র হইতে কিরূপে আবার অল্পে অল্পে দেশ মহাদেশ জীব জন্তু উদ্ভিদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যখন পৃথিবীর বাষ্পাবরণের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড পরিমাণ ছিল তখন সেই বাষ্পাবরণে লৌহ প্রভৃতি ধাতব ও নানা প্রকার আকরিক পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। উষ্ণতার হ্রাস সহকারে ক্রমে সেই বাষ্পরাশি জল রূপে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া যখন সমুদ্র উৎপন্ন করিল, তখন সেই বাষ্পাকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ-রেণুও সেই বৃষ্টি জলের সহিত মিশিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। সেই সকল রেণুই কালে সমুদ্রতলে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্তরসংস্থিতি দ্বারা ক্রমে দেশ মহাদেশ সৃষ্ট

করিয়াছে। ইহা ছাড়া ভূগর্ভস্থ অগ্নির কার্য্য হেতুও পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

সকল দ্রব্যই প্রায় তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় আয়তনে ছোট হইতে থাকে। দ্রব ধাতব পদার্থ ঘন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে অনেক কমিয়া যায়। সেই নিমিত্ত ভূগর্ভ কালে শীতল হইয়া ঘন হইবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বায়তন হইয়া পৃথিবীর কঠিন আবরণের সহিত অসম্বদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন একটি তুলা, পূর্ণ বালিসের কতকগুলি তুলা খুলিয়া লইলে বালিসটি তুবড়াইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পদার্থের আয়তন হ্রাস বশতঃ পৃথিবীর কঠিন আবরণ অন্তরে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভর না পাইয়া, তুবড়াইয়া কোন কোন স্থানে দমিয়া গেল, কোন কোন স্থানে উচ্চ হইয়া পর্ব্বত মালায় পরিণত হইল। হিমালয় আল্‌প্‌ প্রভৃতি আধুনিক উচ্চ পর্ব্বত সকল অধিকাংশ এইরূপে নির্ম্মিত। তাহাদের নিম্নস্থ স্তর প্রথম যুগের নিম্ন ভূমি কিম্বা সাগরতল বটে, কিন্তু ভূগর্ভের উষ্ণতার হ্রাস সহকারে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হঠাৎ [illegible] দ্বারা চারি দিকের ভূমি দমিয়া গেলে হিমালয় ও আল্‌প্‌ প্রভৃতি পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পর্ব্বত শ্রেণী দেখিলে আমাদের মনে কি ভাব হয়? আমরা মনে করি চিরকাল হইতেই ইহা এইরূপ উন্নত অবস্থায় বিরাজমান। কত অল্পে অল্পে

কত যুগযুগান্তের স্তর সংস্থিতি দ্বারা ইহার ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়া, অবশেষে উপরোক্ত প্রকারে উচ্চ হইয়া, পর্ব্বত-শ্রেণী রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমরা হঠাৎ কল্পনা করিতে পারি না।

এইরূপ প্রণালী ছাড়া, অন্তরস্থ অগ্নির প্রভাবে কোন কোন অপেক্ষাকৃত পাতলা স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর দিয়া ধাতু-স্রোত নির্গত হওয়াতে কালে তাহা জমিয়াও বড় ছোট নানা প্রকারের পর্ব্বত হইতে লাগিল। কিন্তু এই-রূপে প্রথমে যে সকল পর্ব্বত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সমুদ্রজলে পুনরায় বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার ভগ্নাবশিষ্ট মৃত্তিকা ছাড়া এখন আর কিছুই নাই। সেই গহ্বর দিয়া গ্র্যানিট প্রস্তর (granite) ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ ব্যতীত, ধাতব ও আকরিক পদার্থ মিশ্রিত উষ্ণ জলস্রোতও বহমান হইতে লাগিল। ঐ জল-মিশ্রিত ধাতুরেণুও স্থিতাইয়া কালে ভূপঞ্জর গঠিত করিয়াছে।

নদীতে যে প্রণালীতে চর পড়ে সেই প্রণালীতে সমুদ্রস্থ পদার্থ-রেণু স্থানে স্থানে স্থিতাইয়া স্থল হইয়া উঠিল, আবার কোন স্থানের বা নব-নির্ম্মিত স্তররাশিকে অমনি চূরমার করিয়া আপন প্রভাবে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহা হইতে কালে আবার অন্যত্রে স্থল উৎপন্ন হইয়াছে। কত পর্ব্বত সমুদ্র-জলে গলিয়া, কত স্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সেই রেণুরাশিতে অবশেষে এই সকল দেশ

মহাদেশ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন আমরা যে সকল দেশ মহাদেশ দেখিতেছি, এইরূপ কত দেশ আবার সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। পার্ব্বত্য গ্রিক উপদ্বীপ অ্যাটিকা যে এককালে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নানা বৃক্ষ-সমাকুল বনপূর্ণ একটি দেশ ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূবেত্তাগণ বলেন তাহা নহিলে তৎস্থানীয় সমুদ্রস্তরে এত বৃহৎ জন্তুর দেহাবশেষ কোথা হইতে আসিবে? ভূবেত্তাগণ নানা কারণ দেখাইয়া বলেন যখন হিমালয় সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তখন ভারতবর্ষ মাডাগাস্কার-দ্বীপ ও মধ্য-আফ্রিকা সংযুক্ত ছিল এবং ইহার পূর্ব্বে এক সময়ে উক্ত দেশ ভারতসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জ ও অষ্ট্রেলেসিয়া এবং আমেরিকা ও ইয়োরোপ যে যুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল পদার্থে ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে, তাহা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

প্রথম—উৎপাত-জনিত মৃত্তিকা।* (Eruptive Rocks) অর্থাৎ যে সকল জ্বলন্ত পদার্থ সকল যুগেই মাঝে মাঝে ভূগর্ভ হইতে সবলে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববর্তী স্তরের মধ্যে

---

* প্রস্তর ধাতু কর্দ্দম ইত্যাদি যত প্রকার পদার্থে পৃথিবী-পঞ্জর গঠিত তাহার সমস্তই মৃত্তিকা নামের বাচ্য হইবে।

প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উৎপাত-জনিত মৃত্তিকা। এ মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন বটে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্তিকার মত স্ফটিকাকৃতি দানাদার (Crystalline)। রাজমহল-পাহাড়ে ও আসানসোলের ডাক বাংলার নিকট এবং অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়—মূল মৃত্তিকা। যে উত্তপ্ত পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে শীতল হইয়া পৃথিবীর আবরণ সৃষ্টি করিয়াছিল, (যাহা আমরা পৃথিবীর উৎপত্তিতে বরফের দৃষ্টান্তে উত্তপ্ত ভূগর্ভের উপর জমাট বাঁধিতে দেখিয়া আসিয়াছি,) সেই সর্ব্বপ্রথমের মৃত্তিকা পরে রূপান্তরিত হইয়া স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। এই মৃত্তিকাকেই মৌলিক মৃত্তিকা (Fundamental gneiss) কহা যায়। এই মৃত্তিকা হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে প্রাপ্তব্য।

পর্ব্বত প্রভৃতি যে সকল স্থানে স্তরাবলী পর্য্যায়ক্রমে মূল দেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারা যায় সেখানে সর্ব্বশেষ স্তরে ইহা অবস্থিত বলিয়া এই মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন স্থির করা যায়।

তৃতীয়—স্থিতান মৃত্তিকা (Sendimentary Rocks)। নানা প্রকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ যাহা সমুদ্রে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্থল উৎপন্ন করিয়াছে—তাহাকেই স্থিতান

মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। যেমন বালি চূণ ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি। বাঙ্গালার সমুদ্র-সন্নিকটস্থ প্রদেশ মাত্রেই এরূপ মৃত্তিকা অপরিমেয়।

এই সকল ধাতব ও আকরিক দ্রব্যের দ্বারা সামুদ্রিক স্তর সংস্থিতির এমনি একটি পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের উৎপত্তির সময় স্পষ্টই ব্যক্ত করে।

প্রত্যেক স্তর যে সকল আকরিক পদার্থে নির্ম্মিত, এবং তাহাতে যে সকল প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহারা পরস্পর এরূপ অসমধর্ম্মী যে, সে সকল পরীক্ষা করিয়াই স্তরের উৎপত্তির সময় নিরূপিত হয়। ভূগর্ভ হইতে মাঝে মাঝে গ্র্যানিট পরফায়েরি ইত্যাদি প্রস্তর ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সবলে উঠিবার সময় যদি সমস্ত স্তর-পর্য্যায় লণ্ড ভণ্ড না করিত, যদি মাঝে মাঝে সমুদ্র দ্বারা সমস্ত স্তর ধৌত হইয়া আবরণবিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে ভূতত্ত্ব বিদ্যা আয়াস-সাধ্য হইত না। প্রত্যেক স্তর চিরকাল একই রূপ সাজান থাকিলে ভূবেত্তারা মাটী খুঁড়িয়া অতি সহজেই তাহার উৎপত্তির সময় নিরূপণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সর্ব্বদা গ্র্যানীটাদির উৎপাত হেতু এবং বন্যা-প্রভাবে ঐ সকল স্তর এত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে অনেক কষ্টে ভূবেত্তাদিগকে স্তরের বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

পৃথিবীতে প্রত্যহই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এক

এক সময় কিছু কাল ধরিয়া এক প্রকার বিশেষ পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়, এই পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা তাহার পূর্ব্ব কিম্বা পরবর্ত্তী শৃঙ্খলা হইতে বিভিন্ন। এক প্রকার পরি-বর্ত্তন-শৃঙ্খলার দ্বারা যে সকল প্রাণী কিম্বা মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে অপর প্রকার পরিবর্ত্তন শৃঙ্খলাদ্বারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রাণী ও মৃত্তিকা উৎপাদিত। এইরূপ এক একটি পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার সময়কে ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় একটি যুগ কহা যায়। যুগ আবার অন্তর-যুগে, ও অন্তর-যুগ গর্ভ-যুগে বিভক্ত। পৃথিবীর জীবন-কাল দুইটি প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, যুগের পর্য্যায় অনুসারে, আর দ্বিতীয়, তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুসারে। পৃথিবীর যুগ-বিভাগ পর-পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে—

যুগ		অন্তরযুগ
প্রারম্ভ বা ইনফ্রা-সাইল্যুরিয়ণ কাল, (Infra-Silurian)	আদি জীব বা Paleozoic	লরেনসিয়ন বা মৌলিক মৃত্তিকা, (Laurentian or Fundamental gneiss.) ক্যাম্ব্রিয়ান, (Cambrian)
১ ম যুগ (Primary Epoch)		সাইল্যুরিয়ন, (Silurian) ডিবোনিয়ান, (Devonian) অঙ্গার জনক বা কার্বনি-ফেরাস, (Carboniferous) পারমিয়ান, (Permian)।
২ য় যুগ (Secondary Epoch)	মধ্য জীব বা Mesozoic (Neo-zoic)	ট্রায়াসিক বা ত্রিস্তর, (Triassic) জুরা-সিক, (Jurassic) ক্রটেসস্ বা চা-খড়ি, (Cretaceous)।
৩ য় যুগ (Tertiary Epoch)	নব্য জীব বা Cainozoic (Neo-zoic)	ইয়োসীন, (Eocene) মায়োসীন, (Miocene) প্লায়োসীন। (Pleiocene),
৪ র্থ যুগ (Post Tertiary Epoch)		বর্ত্তমান কাল।

উপরের তালিকায় দুই প্রণালীতে পৃথিবীর যুগ-বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম স্তম্ভে পর্য্যায়-ক্রমানুসারে যুগ-বিভাগ হইয়াছে, আর দ্বিতীয় স্তম্ভের বিভাগ তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুযায়ী; তৃতীয় স্তম্ভে অন্তর-যুগবিভাগ সন্নিবেশিত। যুগ-পরম্পরার মধ্যে চারিটি স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় সে রূপ নহে সেই জন্য তাহাকে সাধারণতঃ প্রারম্ভকাল বা সাইল্যুরিয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী (InfraSilurian) কাল কহা যায়। দ্বিতীয় স্তম্ভের নামকরণের আর ব্যাখ্যা আবশ্যক করে না।

এখন প্রত্যেক যুগ ও তাহার অন্তর যুগ কিরূপ মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, কিরূপ জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সে যুগে উৎপন্ন তাহার সংক্ষেপে আলোচনা আরম্ভ হইতেছে।

আদিম কালের সেই ভয়ানক ঝটিকা, সেই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত যাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি"তে দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ক্ষান্ত হইলে প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর হইয়া পড়িল। প্রারম্ভ কালে যখন পৃথিবীর প্রথম আবরণ নির্ম্মিত হয় তখন কোন প্রাণী মাত্রেরই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পৃথিবীর উত্তাপ এত অধিক ছিল, যে সে উত্তাপে কোন প্রাণী * জন্মান অসম্ভব। তারাহীন অমাব-

* বিজ্ঞানে জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং এই প্রস্তাবে প্রাণীশব্দে উদ্ভিদাদিও বুঝাইবে।

স্যার রাত্রির ন্যায় নানা প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ সমাচ্ছন্ন অন্ধকার পৃথিবীর নিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য তখন কিরণ দিতে পারিত না। সেই উত্তপ্ত এবং চিররাত্র অন্ধকার পৃথিবীতে কি করিয়া প্রাণী দেখা দিবে? এই সময়কে azoic অর্থাৎ জীবশূন্য সময় কহা যায়।

ক্রমে একদিকে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইয়া মেঘমুক্ত সূর্য্য দেখা দিতে লাগিল, আর একদিকে পৃথিবীর আবরণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণীর বাসোপযোগী হইতে লাগিল। সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যালোক না থাকিলে প্রাণী উৎপত্তি হইতে পারিত না।

অগ্রে উদ্ভিদ কিম্বা অগ্রে জন্তু জন্মাইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, অতি পুরাকালের সমুদ্র-কর্দ্দমে (argillaceous schists) উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়েরই দেহাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু প্রথম যুগের অধিকাংশ সময়ে, বিশেষতঃ অঙ্গার-জনক যুগে উদ্ভিদই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগে প্রাণী অতি বিরল। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে উদ্ভিদই জীবের অগ্রে জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ পৃথিবীর জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে যখন দেখা যায় পৃথিবী অল্পে অল্পে ক্রমশই উন্নতির দিকে গিয়াছে, তখন উদ্ভিদ হইতে জীব জন্তু উন্নততর প্রাণী বলিয়া উদ্ভিদ অগ্রে হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

প্রারম্ভ বা ইন্‌ফ্রা সাইল্যুরিয়ান কাল।

ইনফ্রা সাইল্যুরিয়ান অর্থাৎ সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগের নিম্ন স্তর দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম লরেনসিয়ান বা মৌলিক মৃত্তিকা, দ্বিতীয় ক্যামব্রিয়ান।

সেণ্টলরেন্স নদীর নাম হইতে মৌলিক মৃত্তিকার নাম লরেনসিয়ান হইয়াছে। পৃথিবীর উৎপত্তিতে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর বাষ্পাবরণের ভার এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল। সেই প্রভূত চাপ ও ভূগর্ভ-নিঃসৃত উষ্ণ জলের কার্য্য দ্বারা প্রথম-উৎপন্ন ভূপৃষ্ঠ-মৃত্তিকা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে তাহার আদিম রূপ এখন স্থির করা যায় না, সেই জন্য ইহার আর একটি নাম রূপান্তরিত মৃত্তিকা। এই দ্রবীভূত মৃত্তিকা পুনর্ব্বার ঘন হইবার সময় স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। মৌলিক মৃত্তিকা ছাড়া অন্য দুই জাতীয় মৃত্তিকাও উক্ত রূপ কোন নৈসর্গিক কারণে সময়ে সময়ে রূপান্তরিত (Metamorphosed) হইয়াছে। লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষে হিমালয় আসাম এবং ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে মূল মৃত্তিকা মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সাময়িক স্তরে কোথাও কোথাও ফরমানিফেরা (Formanifera) নামক কীটাণুর দেহাবশেষ দেখা যায়। তাহা ছাড়া ঐ মৃত্তিকায় আর কোন প্রাণী-চিহ্ন দেখা যায় না।

ক্যামব্রিয়ান কাল।

যে সকল পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমান আকারে পরিণত লইয়াছে তাহা এই কেমব্রিয়ান সময় হইতেই আরম্ভ। ওয়েল্‌স্ দেশে প্রথমে এইরূপ মৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয় সেই জন্য ওয়েল্‌সের প্রাচীন নাম কেমব্রিয়া হইতে ইহার নাম ক্যামব্রিয়ান হইয়াছে।

ভূবেত্তাগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেমব্রিয়ান যুগের মৃত্তিকায় অতি অল্পই জীবনের চিহ্ন পাইয়াছেন।

কেমব্রিয়ান মৃত্তিকার কোন কোন স্থানে কেবল কীটচিহ্ন ও কোন কোন স্থানে পুরুভুজের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়। এইরূপ প্রাণীবিরল স্তরের উপরিভাগেই শম্বুকজাতীয় প্রাণীবহুল স্তর-সংস্থিতি দেখিয়া বোধ হয় ক্যামব্রিয়ান যুগের শেষ সময়ে হঠাৎ ভূপৃষ্ঠের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত ইহার পরের স্তরসংস্থিতি হইতেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম যুগের আরম্ভ ধরা যায়। কেননা এই সময় হইতেই পৃথিবীতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণী-সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

কাশ্মীরের উত্তরস্থ ল্যাডাকের সন্নিহিত পীরপঞ্জল এই যুগে উৎপন্ন।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগে জল দ্বারাই প্রায় সমস্ত পৃথিবী বেষ্টিত

ছিল, এবং সেই জলেই আমরা প্রথমে উদ্ভিদ ও জীবের জন্ম দেখিতে পাই। ব্র্যাকিওপোডা (Brachiopoda)—বা বাহুপদী এবং অর্থসিরেটাইটীস (Orthocératites) বা ঋজুশৃঙ্গ এবং আরো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শম্বুক, এবং ট্রাইলোবাইটীস (Trilobites) বা ত্রিকুণ্ডলী বলিয়া একরূপ কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী অতি পুরাতন সমুদ্র-জীব। ইহা ভিন্ন প্রবাল কীট অতি পুরাতন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। একরূপ জলজ উদ্ভিদ এই সকল প্রাণীর সমকালীন। যখন সমুদ্র সরিয়া পড়িয়া আরো দেশ মহাদেশ বিস্তৃত হইল, তখন ক্রমে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতীয় উদ্ভিদ যেমন (Equisetaceae) জাতীর শরগাছ ও তুই এক প্রকার পর্ণী তরু (Fern) এবং অন্যান্য প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি প্রথম যুগের আবার অন্তর-যুগ আছে। প্রথম যুগটি ৪ ভাগে বিভক্ত—সাইল্যুরিয়ান, ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর, কারবনিফরস বা অঙ্গারজনক, পারমিয়ান।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ কেমব্রিয়ান কালের পরবর্ত্তী। এ অন্তর যুগের মৃত্তিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডদেশের স্রপসিয়র ও ওয়েল্‌স দেশে এই মৃত্তিকা প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত প্রদেশের সাইলিয়োরিস নামক প্রাচীন অধিবাসীদিগের নাম হইতে বিখ্যাত-নামা ভূবেত্তা মারকিসন এই মৃত্তিকার সাইল্যুরিয়ান নামকরণ করেন।

সাইল্যুরিয়ান যুগে প্রাণী-চিহ্ন—অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং জীব-দেহাবশেষ বহুল-রূপে লক্ষিত হয়। এ সময়ে এখনো পৃথিবী অন্ধকার। মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য এখনো সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তবে অনবরত বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর বাষ্পাবরণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, কালে যে সূর্য্য-রশ্মি-প্রভাবে পৃথিবীর উন্নত অবস্থা হইবে তাহার লক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই যুগের অতি বিস্তৃত স্বল্প-গভীর সমুদ্র-মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে কোথাও বা অনুর্ব্বর, কোথাও বা জলজ-উদ্ভিদ-বেষ্টিত ভূখণ্ড কোথাও বা অনুচ্চ পাহাড়গুলি মস্তক তুলিয়া আছে। নানা জাতীয় শম্বুক এবং স্ফূটাঙ্গ (Articulated) জীব সেই বিস্তৃত সমুদ্র এবং সেই সঙ্কীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর। একরূপ পুষ্পহীন জলজ-উদ্ভিদ সাইল্যুরিয়ানের সর্ব্ব নিম্ন স্তরে পাওয়া যায়। সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ আবার দুই গর্ভ-যুগে বিভক্ত। অধঃ সাইলুরিয়ান এবং উর্দ্ধ সাইল্যুরিয়ান। আমরা এই যুগের অধস্তরে প্রথম উদ্ভিদ চিহ্ন দেখিতে পাই। ইহার আগে আর উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায় না, কেমব্রিয়ান যুগে কেবল মাত্র পোকা ও পুরুভুজ

ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে উদ্ভিদ যে জীব জন্তুর পরবর্ত্তী ভূবেত্তারা এরূপ নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহারা বলেন সম্ভবতঃ উদ্ভিদই অগ্রে জন্মিয়াছে, তবে উদ্ভিদ যেরূপ অল্পে বিনষ্ট হয় তাহাতে সেই বিপ্লব-পরায়ণ লরেন্সিয়ান ও কেমব্রিয়ান কালে উদ্ভিদ জন্মাইলেও তাহাদের চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার হুকার বলেন সাইল্যুরিয়ান যুগের উর্দ্ধ স্তরে উন্নত জাতীয় এক-রূপ শৈবাল (Lycopodiacea) উদ্ভিদের অসংখ্য বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অরথোসেরাটাইটিস্ বলিয়া এ সময়ে যে এক রূপ সমুদ্র-জীব ছিল তাহাদের শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় তাহারা অন্যান্য সমুদ্র-জীব আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত।

তাহা ছাড়া এই সময়ে কাঁকড়া ও শম্বুক জাতীয় বহু-সংখ্যক জীব দেখিতে পাওয়া যায়। সমেরু জীবের (Vertebrata) মধ্যে সাইল্যুরিয়ানের উর্দ্ধ স্তরে এক জাতীয় মৎস্যের দেহাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব্ব প্রথম মৎস্য।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগে যেরূপ স্তর-বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন যুগে নহে। দর্বিঞ্জি (D'orbigny) সমুদ্র হইতে ৪৬০০০ ফুট উচ্চ আণ্ডিস পর্ব্বত শিখরে প্রাণীদেহাবশেষ সহ সাইল্যুরিয়ন মৃত্তিকা-স্তর পাইয়াছেন। কি ভয়ানক বিপ্লব দ্বারাই ইহা এত

উচ্চে উঠিয়াছিল! ওয়েল্‌স্‌ পর্ব্বতশ্রেণী সাইলুরিয়ান যুগে উৎপন্ন।

সাইলুরিয়ান অন্তর-যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ জলমগ্ন ছিল, ইয়োরোপে কেবল কএকটি দ্বীপ সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। ব্রিটনের পশ্চিম প্রান্তে একটি দ্বীপ, ফ্রান্সের ব্রিটনি ও ফ্রান্সের মধ্য দেশে অপর কএকটি দ্বীপ মাত্র তখন হইয়াছিল। উত্তরে নরওয়ে, সুইডেন ও রুসিয়া পরস্পর সংযুক্ত ভাবে একই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। উত্তর আমেরিকায়, নিউ ব্রিটন দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি ও ব্রাজিলের কতকাংশ, ভারতবর্ষে বাঙ্গালার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, পঞ্জাব, ছোটনাগপুর ইত্যাদি সাইলুরিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল।

ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর অন্তর যুগ।

এই দুই জাতীয় মৃত্তিকা একই যুগে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। সাইলুরিয়ান যুগের সমুদ্র ক্রমে যখন আরো শুকাইয়া আসিল, যখন স্বল্প গভীর সমুদ্র হইতে স্থানে স্থানে কোথাও বা মিষ্ট কোথাও বা লবণাক্ত জলাশয় হইয়া সময়-ক্রমে আবার সেই জলাশয় সমুদ্র হইতে দূরে স্থিত হ্রদরূপে পরিণত হইল, তখন সেই হ্রদে যে স্তরসংস্থিতি হইয়াছিল সেই

মৃত্তিকাই লোহিত প্রস্তর, অর্থাৎ লাল বেলে পাথর। আর সেই একই সময়ে হ্রদের পরিবর্ত্তে সমুদ্র মধ্যে যে সকল মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাকেই ডিবোনিয়ান মৃত্তিকা নামে ভূবেত্তারা আখ্যাত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ডিবন নামক স্থানে এই মৃত্তিকা প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এই যুগকে মারকিসন এবং সেজবিক ডিবোনিয়ান নাম দিয়াছেন।

লোহিত-প্রস্তর-মৃত্তিকা-স্তর লাল, এবং তাহাতে প্রাণী-চিহ্ন বিরল দেখিয়া অধ্যাপক র‍্যামজে বলেন তাহা সমুদ্র-জাত নহে হ্রদ-জাত।

ডিবোনিয়ান অন্তর যুগের যে সকল প্রাণী-দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর। পৃথিবীর বয়ঃ-ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী সকল যে ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথম লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দুই একস্থানে কীটা-ণুর চিহ্নই পাওয়া যায়, কেমব্রিয়ান কালে কেবল মাত্র পোকা ও পুরুভুজের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার পর সাইল্যু-রিয়ান অন্তর-যুগে জলজ উদ্ভিদ, শম্বুক, কাঁকড়া ইত্যাদি দেখা যায়। ডিবোনিয়ান অন্তর যুগে শম্বুক কাঁকড়া ও মৎস্যজাতীয় জীব অপেক্ষা উচ্চতর জীব জন্মে নাই বটে কিন্তু ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতর। বাহুপদী শম্বুকই এ সময়ের প্রধান জীব। এখন ইহারা যেমন বহুসংখ্যক

তেমনি বৰ্দ্ধিতায়তন। অন্যান্য মৎস্য ছাড়া এখন অৰ্দ্ধ ভাগ আঁইস ও অৰ্দ্ধ কঠিন চৰ্ম্মাচ্ছাদিত একরূপ আশ্চর্য্যজনক মৎস্য ছিল। পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী উদ্ভিদ ছাড়া ক্যালেমাইট ও ব্যাঙ্গের ছাতার ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিদ এ সময়ে প্রথম জন্মে। সাইল্যুরিয়ান যুগের ক্রমশ অল্প পরিবর্ত্তন দ্বারা হঠাৎ আর একটি ভিন্ন যুগ আসাতে সাইল্যুরিয়ানের শেষভাগ ও ডিবোনিয়ানের প্রথমাংশ এত মিশিয়া গিয়াছে, যে ডিবোনিয়ানের আরম্ভ স্থান নির্ণয় করা বড় সহজ নয়।

কারবনিফরস্ বা অঙ্গারজনক অন্তর-যুগ।

অঙ্গারজনক অন্তর-যুগ ডিবোনিয়নের পরবর্ত্তী। এই সময়ের উদ্ভিদ হইতেই মৃদঙ্গারের উৎপত্তি। কাৰ্ব্বনিফরস্ দুই গৰ্ভযুগে বিভক্ত, মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ, এবং চুনে পাথর (Carboniferous limestone) গর্ভ-যুগ। কাৰ্ব্বনিফরসের যে সময়ে উদ্ভিদ হইতে ক্রমে মৃদঙ্গার হইয়াছে সেই বিভাগেই মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ। এবং যে সময় সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ-সঙ্কুল স্তরের সংস্থিতি হইয়াছে তাহাই লাইমষ্টোন অর্থাৎ চুণে পাথর গর্ভ-যুগ। ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া গ্র্যানিট পরফায়েরি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত-নির্গত-উষ্ণ জল, চুণ ও বালি পূর্ণ ছিল। সমুদ্র-জলে মিশ্রিত সেই চুণ দ্বারা শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদন হইতেই আবার পরে চূণ উৎপন্ন হয়। চুণে পাথরের স্তর-

গুলি মৃদঙ্গার স্তরের নিম্নস্থিত অতএর ইহা তাহার পূর্ব্ব-সাময়িক। চূণে পাথরের পর্ব্বত সকল সমুদ্রের স্থিতান মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত। এই সকল পর্ব্বতে পুরুভুজ ও দুই তিন প্রকার শম্বুক জাতীয় জীবের এবং মৎস্যের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহাতেই এই সকল পর্ব্বতের সামুদ্রিক উৎপত্তি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ বহুলত্বই কার্বনিফরসের বিশেষ লক্ষণ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল যেমন উদ্ভিদ-বিরল, ইহা তেমনি উদ্ভিদ-বহুল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বের অসীম সমুদ্র-বক্ষে এখন উদ্ভিদাবৃত বহুসংখ্যক দ্বীপপুঞ্জ উঠিয়া স্থলের পরিমাণ বাড়াইয়াছিল।

এ সময়ের জলবাতাস নিতান্ত স্যাঁতসেঁতে ও গরম; নহিলে, যে প্রকার উদ্ভিদ হইতে মৃদঙ্গার জন্মিয়াছে, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব হইত। তখনকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে তখন ঋতুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই একটি মাত্র গ্রীষ্ম ঋতু প্রবল থাকিত। তখন পৃথিবীর কোন অংশেই শীতাতপের বৈষম্য ছিল না, প্রায় সকল অংশেই সমান গরম ছিল। ইহার অনেক পরে, তৃতীয় যুগেই শীতের প্রধান্য দেখা যায়। তখন আভ্যন্তরিক উত্তাপেই সমস্ত পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে সূর্য্যের উত্তাপে তাহার বিশেষ কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। বিষুবরেখার সন্নিহিত গ্রীষ্মপ্রধান

দেশ হইতে উত্তর মহাসাগরের চির তুষারময় মেলবিল দ্বীপ পর্য্যন্ত এবং স্পিটজ্‌বর্জেন হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই এ সময়ে সমজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-প্রাচুর্য্য এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ, এবং মৃদঙ্গারের তৈলময় পদার্থে (bitumenous matter,) অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল এবং জলজান বাষ্প দেখিয়া বোধ হয় এ গর্ভ-যুগে অঙ্গারাম্ল বাষ্পের প্রাচুর্য্য বশতই প্রাণীর সংখ্যা এত বিরল। যাহা হউক কেবল অনুমান ছাড়া এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল এইটুক আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে আমাদের বর্ত্তমান যুগে যে সকল জাতীয় পর্ণীতরু (Fern) নিতান্ত ক্ষুদ্র, অঙ্গার-জনক অন্তর যুগে সেই সকল জাতিই অতি বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ ছিল। এখনকার যে সকল শৈবাল-লতা (Lycopod) দুই হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না, তখন সেই জাতীয়েরাই আশি নব্বই ফুট উচ্চ বৃক্ষ হইত। এক প্রকার শল্কদেহী বৃক্ষ (Lepedodendrons) দ্বারাই তখন প্রায় সমস্ত জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। ইহার এক একটি পাতা ১০ ইঞ্চি লম্বা, এবং স্কন্ধ দুই হাত পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই জাতীয় আর এক রূপ বৃক্ষ ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘায়তনের। এ সময়ের আর এক রূপ বৃক্ষ (Sigellarias) কখন কখন দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট ছাড়াইয়া উঠিত। এই সকল

বৃহৎ বৃক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্ণীতরু দ্বারা তখনকার জঙ্গল পূর্ণ ছিল। সমুদ্র-তীরও ওই সময় নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষে আবৃত থাকিত। ক্যালামাইট নামে এক প্রকার শরগাছ তখন উর্দ্ধে বিশ কি ত্রিশ ফুট এবং বেড়ে এক কিম্বা দুই ফুট হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ক্ষুদ্রায়তন বংশজ এখন ইংলণ্ডে অশ্বপুচ্ছ (Mare's tail) নামে বিখ্যাত। এ সময়ে ঝাউ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্টিকর কোন ফল কিম্বা ফুল তখনো জন্মে নাই। ফুলহীন বৃক্ষাদিপূর্ণ হরিৎ-ক্ষেত্রই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বৃক্ষাদি সংখ্যায় বহুল, অথচ জাতিতে অত্যল্প। এই অন্তর-যুগের শেষ ভাগে কাঁকড়া জাতীয় ট্রাইলোবাইট জীব একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যে ভাগে জীবদেহ-সঙ্কুল স্তর হইয়াছিল তাহা চূণে প্রস্তর গর্ভ যুগ। শম্বুক জাতীয় ৪০০ প্রকার প্রাণী, কাঁকড়া ও মৎস্য জাতীয় অল্প সংখ্যক প্রাণী, এবং পুরুভুজ এই সময়ের অধিবাসী। এ সময়ে একরূপ জলজ সরীসৃপের (Arche gosaurus) কেবল মস্তক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই সময়েই প্রথম সরীসৃপ জন্মে। এতদিন যত প্রকার জীব জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে এ সময়ের গ্যানয়েড (ganoid) নামে একপ্রকার মৎস্য দেখিতে অতি সুন্দর।

এ সময়ের উদ্ভিদ হইতেও অল্প পরিমাণে মৃদঙ্গার উৎপন্ন হইয়াছে।

এই চূর্ণে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে যে সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অধ্যাপক ফিলিপস্ গণনা করিয়া বলেন যে এক লক্ষ ২২ হাজার ৪০০ বৎসরে ৬০ ফুট মাত্র মৃদঙ্গার কিম্বা চূর্ণে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে পারে। এইরূপ মৃদঙ্গারের স্তরের উপর-স্তর নির্ম্মিত হইতে কত সহস্র বৎসরই লাগিয়াছে! এতাবৎকাল কোন বিশেষ ভৌতিক বিপ্লব লক্ষিত হয় না। কিন্তু মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের শেষ কালে ভূপৃষ্ঠের প্রবল বিপ্লব দ্বারা অঙ্গার-শৈল সকল উৎপাদিত রূপান্তরিত ও ভগ্নাবয়ব হইয়া ভিন্ন অন্তর যুগ উৎপন্ন হইয়াছে।

পারমিয়ান অন্তর যুগ।

অঙ্গার-জনক অন্তর যুগের পরেই পারমিয়ান অন্তর যুগের আরম্ভ। রুসিয়ার পার্ম্ প্রদেশের স্তর-সংস্থিতি দেখিয়া মারকিসন ইহার এই নাম দিয়াছেন। সায়েনাইট ও পরফাইরি প্রস্তর এই যুগে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উৎপাত-জনিত উত্তাপে সমুদ্র হইতে বহুল পরিমাণ বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল, এই বাষ্প উপরে উঠিতে উঠিতে শীতল হইয়া বৃষ্টি রূপে আবার পৃথিবীতে পড়িল। সেই বৃষ্টি-সিক্ত মাটীতে সরীসৃপ জাতির পদচিহ্ন লক্ষিত হয়।

পারমিয়ানের প্রাণী প্রায় কার্বনিফরসেরই অনুরূপ, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী যুগের জীব দু একটিও এই যুগে দেখা যায়। এ যুগেই প্রথম ঝিনুক জন্মে। শম্বুক প্রভৃতি অন্যান্য জীব ছাড়া গ্যানয়েড ও প্লাসয়েড মৎস্য এ সময়ে অনেক দেখা যায়। এ সময়ের আবহাওয়া অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তর-যুগের ন্যায়, কিন্তু অধ্যাপক র‍্যামজে দেখাইয়াছেন যে এ সময়ে দুই এক স্থানে হিম-শৈলের কার্য্য (Glacial action) লক্ষিত হয়।

এই তো প্রথম যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল প্রাণীর প্রথম আবির্ভাবই বর্ত্তমান যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রাণীদিগের মধ্যে মনুষ্য এখন যেমন শ্রেষ্ঠ জীব তেমনি এ যুগের সমুদ্রে গেনইড নামক যে উজ্জ্বলবর্ণ মৎস্য বাস করিত, তাহারা তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ট্রাইলোবাইট জাতীয় কাঁকড়া এই যুগে জন্মে এবং এই যুগে তাহা লোপ পায়। পক্ষী কিম্বা স্তন্যপায়ী জীব এখনো জন্মে নাই। উদ্ভিদাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই, এ যুগের শেষ দিকে দু একটি সরীসৃপের পদ-চিহ্ন পাওয়া যায়। এই কালের পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় আবহাওয়া একরূপ, মেরুসন্নিহিত প্রদেশেও যেরূপ আর বিষুবরেখা-সন্নিহিত প্রদেশেও সেইরূপ। পৃথিবী নিজে এই যুগে এত উষ্ণ ছিল যে তাহার উপর সূর্য্য-উত্তাপের বিশেষ প্রভাব ছিল না। পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল গর্ভ হইতে

প্রথমে গ্র্যানিট Granite তৎপরে পরফায়েরি এবং শেষে সায়েনাইট উৎক্ষিপ্ত হয়। স্কটলাণ্ডের বেননেবিস পর্ব্বতে ইহা অতি সুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মূল প্রদেশ গ্র্যানিটের; তন্মধ্য দিয়া পরফায়েরি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই পর্ব্বতের সর্ব্বোপরিস্থ সায়েনাইট স্তর পারফায়েরি ভেদ করিয়া উৎপন্ন।

ভূ-পঞ্জর।

পঞ্চম অধ্যায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম যুগের শেষ ভাগে পৃথিবীর অধিকাংশই জলমগ্ন ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়োৎপন্ন স্কটল্যাণ্ড, উত্তর রুষ ও স্কান্‌ডিনেবিয়াকে উত্তরে রাখিয়া পারমিয়ান অন্তরযুগের য়ুরোপীয় সমুদ্র এক দিকে আয়ারল্যাণ্ড হইতে ইয়ুরেল পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ স্পিটজ্‌বার্জ্জেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য ভাগে সম্ভবতঃ পিরিনীসের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ফ্রান্সের মধ্যদেশ লইয়া একটি দ্বীপ, আধুনিক ব্রিটনি লইয়া আর একটি দ্বীপ, এবং পাদে ক্যালে ও ডুনর প্রদেশ হইতে রাইন নদীর বিপরীত কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেলজিয়াম আর ইংলণ্ডে রথ অন্তরীপ হইতে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই, এ সময়ে য়ুরোপের স্থলভাগ।

ভারতবর্ষে বাঙ্গলার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরাবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ব্যতীতও

পঞ্জাব, সিকিম, ভূটান ও কাশ্মীরের কতকাংশ এবং ব্রহ্ম-দেশের মুলমেন প্রদেশ—পারমিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে এই সকল দেশই কেবল দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভ দেখিয়াছে।

জীবদিগের মধ্যে কাঁকড়াও মৎস্যই যেমন প্রথম যুগে প্রধান, তেমনি দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপই প্রধান জীব। এই নিমিত্ত প্রথম যুগকে মৎস্যের এবং দ্বিতীয় যুগকে সরীসৃপের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের আশ্চর্য্য-রূপ বৃহদায়তন অসংখ্য সরীসৃপ দেখিলে মনে হয় ইহা-রাই এ সময়ের রাজা। জীবরাজত্বের প্রভাব-বৃদ্ধি হেতু এ সময়ে উদ্ভিদরাজ্যের প্রাধান্য হ্রাস হইয়াছিল। ভূবেত্তা-গণ দ্বিতীয় যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত প্রস্তর অন্তরযুগ। (Triassic or new red period)

২। জুরাসিক অন্তরযুগ (Jurassic)

৩। চাখড়ি বা ক্রিটেসস্ অন্তরযুগ (Cretaceous)

ত্রিস্তর অন্তরযুগ।

(Triassic)

ইহার সর্ব্বনিম্নভাগ নূতন লোহিত প্রস্তর স্তর, মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ চূণে প্রস্তর ও শেষ অর্থাৎ সর্ব্বোপরিভাগ লোণা বেলে প্রস্তর-স্তরে নির্ম্মিত। এই অন্তর যুগের প্রথম

অর্থাৎ লোহিত প্রস্তর স্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাহুপদী ও মস্তক-পদী শম্বুক, গেনইড ও প্লাকইড মৎস্য অল্পই পাওয়া যায়।

এখন জীবজগতের পরিবর্ত্তনের সহিত উদ্ভিদেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যে সকল বৃক্ষ ও লতা অঙ্গারজনক যুগে বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের স্থান এখন অন্যান্য জাতি আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ এখন অল্পসংখ্যক, কেবল ঝাউ জাতীয় বৃক্ষই (Conifer) কিছু অধিক।

কতক পুরাতন জীবজাতির এ সময় যেমন লোপ পাইয়াছে তেমনি অসংখ্য অসংখ্য নূতন জাতীয় জীব তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। এই অন্তর যুগে লোহিতপ্রস্তর-স্তর-সংস্থিতির সময়ে কচ্ছপের প্রথম জন্ম ও এই সময় হইতেই সরীসৃপদিগের আধিপত্য আরম্ভ।

পরে কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণপ্রস্তর-স্তর-সংস্থিতি হইবার সময়ে সমুদ্রে অসংখ্য নূতন শম্বুক জাতীয় জীব ও কচ্ছপ, বার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সরীসৃপ এবং কঠিন আচ্ছাদন বিশিষ্ট ছয় প্রকার নূতন মৎস্য উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার কনেক্‌টিকাট নদীর লোণা বেলে পাথর-স্তরে উষ্ট্রপক্ষীর মত বৃহৎ পক্ষীর তিনটি পদাঙ্গুলি চিহ্ন দেখিয়া এই সময়েই প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব অনুমান করা হয়। কিন্তু পক্ষীর কঙ্কাল না পাওয়াতে অনুমান ছাড়া ইহার অন্য প্রমাণ নাই। এ সময়ের মৃত্তিকাতে অনেক প্রকার

সরীসৃপের পদ-চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভেকজাতীয় (Cheirotherium or Labyrinthodon) একরূপ সরীসৃপ অত্যন্ত অদ্ভুত আকার। এই সময়ে অন্য একরূপ বৃহদায়তন অদ্ভুত কুম্ভীর (Nothosaurus) জন্মিয়া ইহার পরবর্ত্তী কালে আরো বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

হ্রদ-শুষ্ক ভিজা মাটিতেই, এই সকল সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া যে মাটী ভিজা থাকে তাহাতে কোন চিহ্ন নিবদ্ধ রহিতে পারে না, অঙ্কিত চিহ্ন আবার জোয়ার আসিলেই ধৌত হইয়া যায়। আমেরিকার লোণা হ্রদের শুষ্ক তটে এখনো এইরূপ চিহ্ন নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

এ সময়ের জঙ্গল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঝাউ বৃক্ষ এবং পর্ণীতরু ও ক্যালেমাইট শর গাছ দ্বারাই পূর্ণ।

লোণা বেলে মাটীর স্তর কৃষ্ণবর্ণ চূণে প্রস্তর স্তরের পরবর্ত্তী। এই মৃত্তিকাতে যে বহুল পরিমাণে লবণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উঠিয়া যাইলে অবশিষ্ট লবণাদি পদার্থ এই সকল স্তরে জমাট রহিয়াছে। সিন্ধু নদের ব-দ্বীপের সন্নিকটস্থ একটি স্থানে এখনো এই রূপে লবণ সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। কচ্ছ দেশে রন্ ঠিক সমুদ্রও নহে, শুষ্ক স্থলও নহে। গ্রীষ্ম কালে এ স্থানের জল শুকাইয়া স্তরে স্তরে লবণ জমিতে থাকে, বৎসরের অপর সময়ে

আবার ইহা জলে আবৃত হয়। একবার সমুদ্রের কার্য্য দ্বারা এই ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিক বালুকার প্রাচীরে বদ্ধ হইলে ইহা আর সর্ব্বদা জলপ্লাবিত হইবে না। সেই সময় সমস্ত আবদ্ধ জল শুষ্ক হইয়া লবণস্তর নির্ম্মিত হইতে থাকিবে। পরে সময়ে সময়ে সমুদ্র-জল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার নূতন স্তরের উপকরণ যোগাইবে। ত্রিস্তরের লোণা বেলেমাটীর স্তরও উপরোক্ত প্রকারে উৎপন্ন। এই স্তরের অতি অল্প স্থানেই প্রাণী-চিহ্ন পাওয়া যায়—তাহাও কোন নূতন জাতির নহে। এই সময়ে বৃহৎ হ্রদবেষ্টিত দ্বীপ উপদ্বীপে মাঝে মাঝে দুই চারিটি পর্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রকূলে উদ্ভিদের অভাব নাই, সেই উদ্ভিদাবশেষ এখনো অপর্য্যাপ্ত। লোণা স্তরের উদ্ভিদ অনেকটা পরবর্ত্তী অন্তর যুগের ন্যায়।

কটক হইতে ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী এবং পুনা হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ত্রিস্তর যুগের প্রস্তর পাওয়া যায় বলিয়া ভূবেত্তাগণ ঠিক করিয়াছেন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের উভয় পার্শ্বস্থ সমুদ্র উপকূল এই সময়ে উৎপন্ন। এই সময়ে সিকিম ও ভূটান লইয়া প্রায় চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল।

জুরাসিক অন্তরযুগ।

এই অন্তর যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং ত্রিস্তর অন্তর-

যুগের অব্যবহিত পরে উভয়ের মধ্যে আর একটি মৃত্তিকা-স্তর পাওয়া যায়। ইহা দুই অন্তর যুগের কোনটিরই অন্তর্গত নহে। এই স্তর অতি অল্পই গভীর বলিয়া ইহার আর বিশেষ বিবরণের আবশ্যক বোধ হইল না, ভূবেত্তারা ইহাকে রিটিক অথবা পেনার্থ, গর্ভযুগ বলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে জুরাসিক অন্তরযুগ একটি প্রধান। ফ্রান্সে জুরা নামক পর্ব্বত-শ্রেণী এই যুগের মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই যুগের নাম জুরাসিক হইয়াছে। জুরাসিক অন্তরযুগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। লায়াস—অর্থাৎ কর্দ্দমময় চূর্ণস্তর, এবং ওয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকার প্রস্তর-স্তর। এই দুই রূপ বিভাগ জুরা পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই দুই ভাগে জুরা অন্তরযুগকে ভাগ করা গিয়াছে। জুরাসিক অন্তর যুগের উদ্ভিদ ও জীব সমূহে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

পূর্ব্ব সময়ের অনেক জাতীয় জীব এ যুগে লোপ পাইয়া নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪০০০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতীয় জীব এসময়ে উৎপন্ন। কর্করাল চূর্ণে পাথর ও চূর্ণযুক্ত বেলে-কর্দ্দম দ্বারা জুরা অন্তর যুগের প্রথম স্তর লায়াস মৃত্তিকা নির্ম্মিত। লায়াস গর্ভযুগ আবার দুই তিনটি স্তরবিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তরে মৃত্তিকার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

অ্যামোনাইট * ও বেলেম্‌নাইট † নামক শম্বুক এবং ঝিনুক এই সময়ের সমুদ্রে প্রচুর। অনেক প্রকার নূতন জাতীয় শম্বুক, মৎস্য, পুরুভুজ, ঝিনুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীব ব্যতীত, অসংখ্য অদ্ভুদাকার সরীসৃপ এই সময়ে উৎপন্ন হয়। এই অদ্ভুত সরীসৃপদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান। এক প্রকার সরীসৃপের (Ichthyosaurus) শরীর বড় আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত; এখনকার ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, শরীর ও লেজ চতুষ্পদ জীবের ন্যায়, অস্থি-গ্রন্থি (Vertebra) মৎস্যের ন্যায় এবং পাখনা তিমি মৎস্যের ন্যায়।

ইংলণ্ডের লাইম রিজিস নামক স্থানে মেরি অ্যানিং নামক একটি গ্রাম্য বালিকা তৎস্থানীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর কঙ্কাল আনিয়া বিক্রয় করিত। সে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জীব-কঙ্কাল খুজিতে খুজিতে প্রস্তরের মধ্য হইতে নির্গত এক খণ্ড অস্থি দেখিতে পায়, এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহা একটা প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড জীবের দেহাবশেষ বুঝিয়া লোক দ্বারা তাহাকে স্থানান্তরিত করে। এ প্রকার প্রকাণ্ড জীব এই রূপে প্রথমে মানুষের নেত্র-

---

* অর্থাৎ মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্রাকার।
† অর্থাৎ তীরবৎ সূক্ষ্মাগ্র।

গোচর হইল। এই অদ্ভুত জীব প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। ইহার চোয়াল প্রায় ৬ ফুট এবং চক্ষুদ্বয় এক একটা বড় রেকাবীর মত। ইহার চক্ষুদ্বয় এমনি সুন্দর অবস্থায় প্রস্তরীভূত হইয়াছিল যে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এমনি হিংস্রজন্তু যে নিজের জাতিকেই নিজে ভক্ষণ করিত।

দ্বিতীয় প্রকার সরীসৃপ (Plesiosaurus) আরো অদ্ভুত, ইহাও সামুদ্রিক হিংস্রজন্তু। ইহারও মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, কিন্তু ইহার গলা রাজহংসের গলার মত, অথচ লম্বায় অনেক বড়। ইহার পঞ্জর বহুরূপীর ন্যায়, এবং তিমি মৎস্যের পাখনার অনুরূপ ইহার চারিটি পাখনা। ইহার দেহ ও লেজ হ্রস্ব বলিয়া দেখিতে ইহা অনেকটা কচ্ছপের মত। এই সরীসৃপের তুলনার দ্বারা বোধ হয় যে প্রথমোক্তটি গভীর জলবাসী ও শেষোক্তটি কূলের নিকটে থাকিত।

তৃতীয় প্রকার সরীসৃপ (Pterodactylus) কতকটা বাদুড়ের মত, কিন্তু ইহার ঠোঁট কুক্কুটের মত লম্বা, দন্ত কুম্ভীরের ওষ্ঠাগ্রের মত, অস্থি-গ্রন্থি, পঞ্জর ও পদাদি কৃকলাসের মত। ইহার শরীরে ডানা আছে অথচ পক্ষীদিগের পালক কিম্বা বাদুড়ের ন্যায় লোম নাই। বাদুড়দিগের ন্যায় ইহাও রাত্রিচর ও পতঙ্গভুক, কিন্তু ইহার শরীরের প্রধান প্রধান অস্থির গঠন সরীসৃপের ন্যায়।

এই জন্তুর শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় পক্ষসত্ত্বেও ইহা উড়িতে পারিত না। এই সকল সরীসৃপ জীবদেহ যেরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে ইহারা হঠাৎ কোন বিপ্লবে বিনষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। এই সময়কার উদ্ভিদ ইহার পূর্ব্ব অন্তরযুগের মত, কেবল এক জাতীয় নূতন উদ্ভিদ (Cycad) এই যুগে প্রথম জন্মে।

ওয়োলাইট গর্ভ যুগ।

এই গর্ভ যুগের মৃত্তিকা গোল গোল দানা-বিশিষ্ট, সেই নিমিত্ত গ্রীক ভাষায় ইহা উয়োলাইল অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি আখ্যাত হইয়াছে। এই গর্ভ যুগের বিশেষ লক্ষণ স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব। স্তন্যপায়ী জীবের সন্তান জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, অন্য প্রকার জীব অণ্ডজ। সর্ব্ব প্রথমে যে সকল স্তন্যপায়ী জীব জন্মে তাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। এ প্রকার জীবের সন্তান প্রসূত হইয়া মাতার উদরের নিকটস্থ একটি চর্ম্মের থলিয়ায় অবস্থিতি করে এবং সেইখান হইতে স্তন পান করিয়া বড় হইলে বাহির হয়, যেমন আধুনিক কাঙ্গারু। এইরূপ স্তন্যপায়ী জীবকে মারস্যুপিয়াল জাতি (Marsupial) কহে। ওয়োলাইট গর্ভযুগে এইরূপ স্তন্যপায়ী জাতিরই জন্ম হয়। পূর্ব্ব অন্তর যুগের ন্যায় এ যুগেও শম্বুক ঝিনুক ইত্যাদি

নানা প্রকার নূতন সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল কীট জন্মে। এই যুগেও আবার ৩।৪ প্রকার প্রকাণ্ড নূতন সরীসৃপ-কঙ্কাল দেখা যায়। ইহারা অনেকটা আমাদের গাঙ্গেয় কুম্ভীরের মত। ইহার মধ্যে একটি (Cetiosaurus) পঞ্চাশ ফুট লম্বা, এই প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যাকার সরীসৃপ দেখিয়া অধ্যাপক ফিলিপস্ বলেন যে ইহার ন্যায় বলবান ও প্রকাণ্ডকায় জীব পৃথিবীতে কখনো জন্মে নাই।

এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃহৎ আরণ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব গর্ভ যুগের ন্যায় এ গর্ভযুগও তিন স্তরে বিভক্ত। ওয়োলাইট যুগের চূণেপ্রস্তর কি প্রকারে কর্করাল হইয়াছে তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। অনেকে বলেন যেমন এখন টেনেরীফজলমগ্ন শৈলে এবং ইটালির ত্রিবলির জলপ্রপাতে জল ঘর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা কর্করাল হয়, তেমনি জলের ঘর্ষণ দ্বারাই ওয়োলাইট মৃত্তিকা কর্করাল হইয়াছে। কিন্তু যেখানে জলের ঘর্ষণ সম্ভাবনা নাই সেখানেও যখন ঐরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় তখন বোধ হয়, যেমন কোন অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ফাটিক পদার্থের একটি বিশেষ আকৃতি হয় ইহাও সেইরূপ একটি নিয়মের বশবর্ত্তী। জুরাসিক অন্তরযুগ পর্য্যন্ত পৃথিবী নিয়মিত সমান রূপে শীতল হইয়া আসিতেছিল এবং এখন অবারিত বৃষ্টির

প্রাচুর্য্য অনেক কম। পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার অদ্ভুত জন্তুই এখানকার পৃথিবীর প্রধান অধিবাসী; সমুদ্র শম্বুক বহুল এবং প্রকাণ্ড কচ্ছপে পরিপূর্ণ।

কেবল এক জাতীয় স্তন্যপায়ী জীবমাত্র এখন জন্মিয়াছে পতঙ্গাদি জীবই শূন্যের অধিপতি, পক্ষী এখনো জন্মায় নাই। ভারতবর্ষে রাজমহল কচ্ছদেশ শ্রীহট্ট ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এই সময় উৎপন্ন।

চাখড়ি বা ক্রিটেসস্ অন্তর যুগ।

এই অন্তরযুগের সমস্ত স্তরই প্রায় চাখড়ি-নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম চাখড়ি অন্তর যুগ। কিন্তু এই সময়েই যে প্রথম পৃথিবীতে চাখড়ি দেখা দেয় এমন নহে, সাইল্যু-রিয়ান অন্তরযুগ হইতে ক্রমাগতই চাখড়ি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু চাখড়ি-স্তরসংস্থিতিই এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদনের উপর উষ্ণ জলের প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে চাখড়ির স্তর জমিতেছিল। পরে কি প্রকারে এই সকল স্তর সমুদ্র-গর্ভ হইতে উন্নমিত হইয়া শৈলশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। এবিষয়ের যথার্থ কারণ এখনো নিশ্চিতরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে সর চারল্স্

লায়েল এবং অধ্যাপক রামজে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ চাখড়ি পর্ব্বত উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বলেন, যে এখনকার গ্রেট ব্রিটন ও তৎসন্নিহিত দেশ পুরাকালের কোন এক বৃহৎ মহাদেশের মধ্য দিয়া বহমান প্রকাণ্ড নদীর ব-দ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাঁটার কার্য্য বশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চাখড়ি, সেই নদীর মোহানায় জমিয়া জমিয়া ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতরূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ মহাদেশ য়ুরোপ নহে, উহা এক্ষণে জলমগ্ন হইয়াছে। লায়েলের মতে উহা আমেরিকা কিম্বা আসিয়া অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল; তিনি আরো বলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অনেক মহাদেশ বারম্বার জলমগ্ন হইয়াছে। চাখড়ির যে পর্ব্বত গুলি স্থানে স্থানে দেখা যায় তাহা সেই মহাদেশের চিহ্নাবশেষ মাত্র। এই সময় হইতে পৃথিবীর বর্ত্তমান আকৃতির সূত্রপাত। ফরাসী ভূবেত্তা লেকক বলেন যতই আমরা বর্ত্তমান কালের নিকট আসিতেছি ততই দেখিতে পাই যে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে মৃত্তিকা স্তর সংস্থিতি বন্ধ হইয়া মধ্যদেশই নূতন মৃত্তিকা সংস্থিতি দ্বারা ফুলিয়া উঠিতেছে।

এখনকার শীতাতপ প্রধানতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এখন বৎসরে ঋতুর বিভাগ আরম্ভ হইল। শীতাতপের বৈষম্য হেতু পৃথিবীর উপরি ভাগে কটিবন্ধ প্রথম উৎপন্ন হইল। এখনকার

উদ্ভিদ আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদের প্রথম সোপান স্বরূপ। এ অন্তর যুগের উদ্ভিদজাতিই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদ রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই অন্তর যুগের এবং বর্ত্তমান সময়ের জীবজন্তর মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। তাল জাতীয় বৃক্ষ পৃথিবীতে এই প্রথম উৎপন্ন হইল এবং এই সময়ে উৎপন্ন ওক আকরোট ও বট বৃক্ষ এখনো পৃথিবীতে বর্ত্তমান। এ সময় পর্ণীতরু খুব কমিয়া আসিয়াছিল। জন্তর মধ্যে এখনও সরীসৃপ প্রধান। এই অন্তরযুগের সরীসৃপদিগের মধ্যে যে দুই তিনটির দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনি প্রকাণ্ড। ইহার মধ্যে একটির দেহ একটি বৃহদাকার হস্তীর ন্যায়।

এই সময়েই প্রথম পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে নর্ম্মদা প্রদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সংলগ্ন উপকূল, এই সময়ে উৎপন্ন।

ভূ-পঞ্জর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তৃতীয় প্রস্তাব।

তৃতীয় যুগ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ আফ্রিকা সংলগ্ন একটী মহাদেশভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বে আধুনিক আসামের অধিকাংশ, পশ্চিমে সম্পূর্ণ না হউক প্রায় সমস্ত পারস্য, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু নদীর সন্নিহিত প্রদেশ, এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া সমুদ্র অবস্থিত ছিল। এই পশ্চিম সমুদ্রের এক শাখা কাশ্মীরের মধ্য দিয়া ল্যাডাক উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশ সমুদ্র হইতে অল্পই উচ্চ ছিল, পরে যে বিপ্লব দ্বারা ক্রমশ হিমালয় উন্নত হইয়াছে, যাহার দ্বারা হিমালয়ের স্তর সকল লণ্ড ভণ্ড হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা ইয়োসিন অন্তরযুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান কালেও চলিতেছে।

হিমালয়পর্ব্বত, আসামপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, কচ্ছ ও সিন্ধু দেশে মাঝে মাঝে এখনো যে প্রবল ভূকম্পন দেখা যায় তাহা সেই বিপ্লবের ধারাবাহিত্বের প্রমাণ। এই বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ সত্বেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে হিমালয়সন্নিহিত প্রদেশের অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হওয়াতে সেই সকল স্থান দমিয়া হিমালয়কে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের সহিত সংলগ্ন ছিল কি না নিশ্চয় বলা যায় না তবে সংলগ্ন থাকাই আধুনিক ভূবেত্তাগণ সম্ভবপর মনে করেন।

অনেক ভূবেত্তাদের মত যে এতাবৎকাল দাক্ষিণাত্য ও হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে ইয়োসিন অন্তরযুগের শেষ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় যুগেই প্রথম গঙ্গা ও সিন্ধু মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র শুকাইয়া উপরোক্ত উভয় প্রদেশ সংলগ্ন হইল। কিন্তু ভূবেত্তা ব্ল্যানফর্ড বলেন * সম্ভবতঃ চাখড়ি অন্তর যুগের শেষ হইতেই ভারতবর্ষ-উপকূল স্থূলতঃ আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। একটি, যদি চাখড়ি অন্তর

---

* See Medlicott aud Blandford's Manual of the Geology of India, Vol 1—Int.

যুগের শেষে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ একই-সংলগ্ন ভূখণ্ড না হইয়া সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকিত, তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে উৎপন্ন সমুদ্র মৃত্তিকা-স্তরে সামুদ্রিক জীব কঙ্কাল পাওয়া যাইত, কিন্তু রাজমহেন্দ্রী হইতে গারো পর্ব্বত পর্য্যন্ত এ সময়ের মৃত্তিকায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে স্থূলচর্ম্মী জন্তু, ([illegible]) হস্তী মহিষ ইত্যাদি জন্মিবার আগে ভারতবর্ষের উত্তর ভাগেই এই সকল জন্তু উৎপন্ন হয়, কেন না উত্তরেই তৃতীয় যুগের প্রথম ইয়োসিন অন্তর যুগের মৃত্তিকায় হস্তী ও মহিষ জাতীয় স্থূলচর্ম্মী জীবকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। পরে শীতের তাড়নে উহারা উত্তর হইতে দক্ষিণে পলায়ন করে। যে সকল প্রাণী উত্তরে লোপ পাইয়াছে তাহারা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে এবং ইহার সম-নিরক্ষান্তর প্রদেশে এখনো বর্ত্তমান, এবং দাক্ষিণাত্যে আবার যে সকল জীব এখন বিলুপ্ত তাহা আফ্রিকায় দেখা যায়। যদি চাখড়ির শেষে ভারতবর্ষ উপকূল সংলগ্ন না থাকিত তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রথমেও সমুদ্র দ্বারা উত্তর দক্ষিণ বিচ্ছিন্ন থাকিত; তাহা হইলে কি করিয়া স্থূলচর্ম্মী জাতি দক্ষিণে উপস্থিত হইবে? তাহা হইলে তৃতীয় যুগের মধ্য অন্তর যুগ মায়োসিন কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মৃত্তিকাতে হস্তী, মহিষ কঙ্কাল পাওয়া যাইত না।

ব্ল্যান ফর্ডের মতে ভারতবর্ষের উপকূল চাখড়ি অন্তর যুগের শেষাংশ হইতে স্থূলতঃ প্রায় একই রূপ আছে, তবে চাখড়ি অন্তর যুগে ভারতবর্ষের উপকূলে মাঝে মাঝে যে সকল সমুদ্র-শাখা প্রবিষ্ট ছিল তাহা কালে শুকাইয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে।

কচ্ছ ও কাটিবার প্রদেশ পূর্ব্বে দ্বীপাকার ছিল, ইহা তৃতীয় যুগেই বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ তৃতীয় যুগের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে তাহা এরূপ সমতল ক্ষেত্র কি করিয়া হইল? সমুদ্র-গর্ভ শুকাইয়া মাটী হইলে সেই নূতন স্থল প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নীচু হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্রই এক রূপ উচ্চ বলিয়া সমতল ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ যদি বহুদিন উৎপন্ন স্থল হয় তবে ইহা কি করিয়া সমতল হইল?

যে কারণে হিমালয় উচ্চ হইয়াছে সেই কারণে সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশও সমতল হইয়াছে। একটা গোলাকার বস্তুর কোন স্থান নীচু হইয়া চেপটা হইয়া পড়িলে অর্থাৎ কোন গোলাকার পদার্থ ক্রমশঃ সরল রেখার অনুরূপ হইতে সচেষ্ট হইলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং অধিক স্থানের অভাব হইলে এক দিক উচ্চ ও এক দিক নীচু হইয়া পড়ে। সেই নিয়ম অনুসারে ভূগর্ভের সঙ্কোচন হেতু সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ নীচু ও হিমালয় উন্নত হইয়াছে।

গণনা দ্বারা দেখা যায় যে সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশের অবনতি বশতঃ হিমালয়ের বর্ত্তমান উচ্চতা উৎপন্ন হইতে পারে না; উহাতে হিমালয়কে উর্দ্ধ সংখ্যা সাত হাজার ফুট উন্নত করিতে পারে। সুতরাং সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশের অবনতি ও হিমালয়ের উন্নতির পরস্পর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই—এতদুভয়ই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির ক্রিয়া ফল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োরোপের ভূপৃষ্ঠ অবস্থা কিরূপ ছিল এইবার দেখা যাউক।

ক্রিটেসস অন্তর যুগের শেষে ইয়োরোপে সমুদ্র ভাগই অধিক। স্পেন এবং ইটালির অধিকাংশ, হলাণ্ড, সুইজার-লাণ্ড, প্রসিয়া, হানগেরি, ওয়ালেকিয়া, উত্তর রুসিয়া ও পারিসের কতকাংশ লইয়া চাখড়ি অন্তরযুগের শেষে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এ সময় জুরাসিক যুগ উৎপন্ন সারবর্গের (Cherbourg) ভূখণ্ডের দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সংযুক্ত ছিল। পরে ঐ ভূখণ্ড সমুদ্রগ্রস্ত হওয়াতে অধুনা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় যুগে ক্রমশঃ ক্রিটেসস অন্তর যুগের এই বিস্তৃত মহা সমুদ্র শুকাইতে আরম্ভ করিয়া ইয়োরোপের আধুনিক স্থল ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে নূতন প্রাণী জাতির আবির্ভাব। এ সময় প্রায় সমস্ত পুরাতন স্থলচর

প্রাণী অন্তর্হিত করিয়া স্তন্যপায়ী জীবের দ্বারাই পৃথিবীর স্থলভাগ পূর্ণ হইল। প্রথম যুগে মৎস্য ও দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপদিগের যেমন বিশেষ রূপ প্রাদুর্ভাব, তেমনি এই যুগে স্তন্যপায়ী জীবই প্রধান, সেই জন্য ইহার আর একটি নাম স্তন্যপায়ী যুগ। এই সময়ে যে কত আকৃতির কত অসংখ্য প্রকারের স্তন্যপায়ী জীব ছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয়ই করিতে পারেন না।

আমরা দ্বিতীয় যুগের জুরাসিক সময়ের যে কাঙ্গারু জাতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কথা বলিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তৃতীয় যুগের স্থূলচর্ম্মী অর্থাৎ হস্তী মহিষ প্রভৃতি জাতীয় জীবই পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী জীব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৃতীয় যুগকে যে তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহার প্রথম ভাগে এই জাতীয় জীবেরই অধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এবং আর দুই ভাগের স্তন্যপায়ী জীব সকল এত প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত গঠনের যে তাহাদের জাতীয় সাদৃশ্যও এখনকার জীবে পাওয়া যায় না, সে সকল জাতীয় জীব এখন সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত। কেবল তৃতীয় যুগের শেষাংশে যে সকল জীব জন্মিয়াছে তাহার অধিকাংশ এখনও বর্ত্তমান। এ যুগের শেষ দিকে অনেক পক্ষী ছিল বটে কিন্তু তাহারা স্তন্যপায়ী জীবের মত বহু সংখ্যক নহে। কুম্ভীরাকার এক রূপ প্রকাণ্ড সরীসৃপ তৃতীয় যুগের সকল সময়েই দেখা যায়। আমাদের বর্ত্ত-

মান সময়ের মত তৃতীয় যুগের সমুদ্রে নানা জাতীয় নানা প্রকার জীবের বসতি, কিন্তু দ্বিতীয় যুগে আমরা অ্যামোনাইট বেলেম্‌নাইট, ইত্যাদি যে সকল শম্বুক জাতির প্রাচুর্য্য দেখিয়াছি তাহা আর এখনকার সমুদ্রে নাই। এ যুগের শম্বুক জাতীয় যে সকল জীব দেখা যায়, তাহা অনেকটা আমাদের সময়ের মত।

এ যুগের আশ্চর্য্য রূপ প্রাণী-প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এ সময়ে ফারমিনিফেরা ও নিউমিলাইট নামক শম্বুক জাতীয় ক্ষুদ্র জীব এত বহু সংখ্যক একত্রে বিচরণ করিত যে ইহাদের দেহাবশেষ দ্বারা এক এক স্থানে শতাধিক ফুট পরিমাণ স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নহিলে ইহাদের দেখাই যায় না।

এই যুগের কতক উদ্ভিদ আমাদের উদ্ভিদের কাছাকাছি, আর কতক একেবারে আমাদের মত। ফুল ও ফল এই প্রথম হইল। নানা বর্ণের ফুল ও নানা রূপ ফল দ্বারা এখন চৌদিক সুশোভিত। বন ফুল-শোভিত হরিৎবর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্রে কীট পতঙ্গের সীমা নাই। বৃহৎ বৃহৎ ফুল-বৃক্ষ-সঙ্কুল বনে নানা প্রকার পাখীদের বসতি। বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর মেঘান্ধ বাষ্পাবরণ ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া এই সকল সূক্ষ্ম ফুস ফুস বিশিষ্ট জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূপঞ্জর এখন এত স্থূল যে আভ্যন্তরিক উত্তাপ

আর বড় উপরে উঠিতে পারে না। তৃতীয় যুগে পৃথিবীর উত্তাপ স্থূলতঃ বর্ত্তমান সময়ের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় ছিল, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপের ন্যূনাধিক্য বশতঃ পৃথিবীর দ্রাঘিমা ভেদে শীতাতপের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং মেরু দেশে অল্প অল্প শীত দেখা দিয়াছে।

প্রচুর বৃষ্টি দ্বারা এই সময়ে যে সকল প্রধান প্রধান নদী ও পরিষ্কার জলের হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল পরে সেই সকল প্রকাণ্ড নদী-মোহানার ব-দ্বীপই ক্রমে নূতন নূতন দেশ রূপে পরিণত হইল। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে এখন জল ও স্থল যে অবস্থায় দেখিতেছি ইহা তৃতীয় যুগেরই শেষ ভাগে এই রূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় যুগটি বিখ্যাত লায়েল তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ইয়োসিন মায়োসিন ও প্লায়োসিন ইয়োসিন অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রারম্ভ, মায়োসিন অর্থাৎ অল্পাধুনিক, প্লায়োসিন অর্থাৎ অধিকাধুনিক। এই সকল আখ্যা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের জীব জন্তু হইতে তৎসাময়িক জীব জন্তুর প্রভেদ দর্শাইতে তিনি এই রূপ নামকরণ করিয়াছেন।

এখন এই তিন ভাগের স্থূল লক্ষণ সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ অংশ শেষ করা যাউক।

ইয়োসিন অন্তর যুগ।

পূর্ব্বের সেই মহা সমুদ্রের অনেক অংশ এখন স্থলে

পরিণত। নানা নদ নদী হ্রদ ও তড়াগে শোভিত-স্থল এখন নানা প্রকার উদ্ভিদ ও জীবজন্তু পূর্ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ, এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান যুগের উদ্ভিদ এই যুগে একত্রে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা জাতীয় লুপ্ত বৃক্ষের সহিত আধুনিক বার্চ আকরোট ওক কেলু ও ঝাউ জাতীয় দেবদারু, ফার, ইউ, সাইপ্রেস ইত্যাদি নানা প্রকার বৃক্ষ একত্রে বিরাজমান।

নানা জাতীয় পর্ণীতরু শৈবাললতা ও জল-উদ্ভিদের অভাব নাই। আশ্চর্য্য এই, তখনকার সরোবরে আধুনিক জলজ উদ্ভিদ অনেক দেখা যায়, যেমন এক রূপ পানিফল (Watcr caltrop)। স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, কীট, কচ্ছপ, শম্বুক ইত্যাদি এই যুগের জীব। এ সময়ে ইয়োরোপের উত্তাপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত ছিল বলিয়া আধুনিক গ্রীষ্ম দেশের জীবকঙ্কাল এ সময়ে ইয়োরোপের মৃত্তিকাতে অনেক পাওয়া যায়। এই যুগের স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্থূলচর্ম্মীরাই প্রধান। এই সময়ে প্যালিওথেরিয়াম অর্থাৎ পুরাতন জন্তু অ্যানোপ্লথেরিয়াম অর্থাৎ নিরস্ত্র জন্তু ও জিফাডন বলিয়া যে সকল স্থূলচর্ম্মী জন্তু ছিল তাহারা উদ্ভিদাহারী এবং পালে পালে থাকিত। তাহাদের শারীরিক আকার ঘোড়া গণ্ডার ও শূকরের মধ্যবর্ত্তী। এই জাতীয় নানা প্রকার ও নানা আয়তনের জীবকঙ্কাল এই যুগে দেখা যায়।

এই সকল জন্তু ছাড়া ইয়োসিন অন্তরযুগে উৎপন্ন প্যারিসের সন্নিহিত সোহাগার আকরে শূকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রকার স্থূলচর্ম্মী জীবকঙ্কাল এবং শ্বাপদ পক্ষীর পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়েই নিউমিউলাইট নামক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বুক দ্বারা সমুদ্র পূর্ণ ছিল এবং এই সকল মৃত জীব-স্তর দ্বারা পিরিনিস পর্ব্বতশ্রেণী স্থানে স্থানে নির্ম্মিত, এবং এই স্তর দ্বারাই ইজিপ্টের লোকেরা পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল দ্বারা শত শত ফুট উচ্চ স্তর হইতে কত শত বৎসর লাগিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তৃতীয় যুগের এই নিউমিলাইট মৃত্তিকা-স্তর ইয়োরোপ আসিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল স্থানেই পাওয়া যায়। এক এক স্থানে নিউমিউলাইট স্তর সহস্র সহস্র ফুট উচ্চ।

ইয়োসিন মৃত্তিকার মধ্য ভাগে নিউমিউলাইট স্তর সন্নিবেশিত, কিন্তু এই স্তর হিমালয়, কারপেথিয়ান, আল্প, পিরানিস পর্ব্বতের অতি উচ্চাংশে দেখিয়া মনে হয় এই যুগে পৃথিবীতে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল! সেই বিপ্লবের দ্বারাই ঐ সকল পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ নির্ম্মিত।

ইয়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, সিন্ধু আসামের কতকাংশ, এবং ব্রহ্মদেশে চূণে প্রস্তর স্তর উৎপন্ন। হিমালয় যে এই যুগ হইতেই পর্ব্বত রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ময়োসিন অন্তর যুগ।

শীত গ্রীষ্ম উভয় দেশের উদ্ভিদ এই অন্তরযুগে একত্রে জন্মিয়া ইহাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরযুগ হইতে ভিন্ন করিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা দেশের নানা প্রকার বৃক্ষ এবং শীত দেশের ম্যাপল আকরোট পিচ এলম ওক, ও বাঁশ তাল প্রভৃতি বৃক্ষাদি ইয়োরোপে এই অন্তর যুগে এক সঙ্গে জন্মে। ইহা ছাড়া এ সময়ে ডুম্বুর বটবৃক্ষ প্রভৃতিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবালউদ্ভিদ, পর্ণী-তরু এবং ঝাউজাতীয় বৃক্ষ পূর্ব্ব অন্তরযুগ অপেক্ষা এখন সংখ্যায় অল্প এবং তালজাতীয় বৃক্ষই বহু সংখ্যক। পূর্ব্ব অন্তর যুগের বৃক্ষাদি ছাড়া এ সময়ে ঝাউ ও তাল জাতীয় অনেক নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। সংক্ষেপে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত বৃহৎ বৃক্ষেরই প্রথম ছাঁচ এই অন্তর যুগে দেখিয়া মনে হয় উদ্ভিদরাজ্য এ সময়ে তাহার উন্নততম অবস্থায় উঠিয়াছে। এই যুগের বৃক্ষাদি হইতে এক প্রকার নিকৃষ্ট অঙ্গার উৎপন্ন। *

---

* সুইজরল্যাণ্ডের এ অন্তর যুগের মৃত্তিকা এরূপ উদ্ভিদাবশেষ সমাকীর্ণ, যে অধ্যাপক হিয়ারের (Heer) মতে এস্থান তৎকালে ব্রেজিল ও অ্যামেকার সদৃশ নিবিড় অরণ্যময় ছিল। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান আমেরিকউদ্ভিদ এত প্রচুর পাওয়া যায় যে উঙ্গের (Unger) বলেন মায়োসিন অন্তর

স্তন্যপায়ী, পক্ষী, এবং সরীসৃপ এ সময়ের প্রধান জীব। এ সময় অনেক নূতন স্তন্যপায়ী জন্মিয়াছে। এ সময়ের উৎপন্ন পশুদের মধ্যে বানর বাদুড় কাঙ্গারু জাতীয় নানাবিধ জন্তু কুকুর ইঁদুর তাহা ছাড়া অনেক মাংসাশী ও রোমন্থক পশু কাটবিড়াল এবং খরগোস জাতীয় অনেক প্রকার জীব, পক্ষীদিগের মধ্যে চড়াই বক কাক ইত্যাদি, সরীসৃপদিগের মধ্যে সাপ ব্যাং গিরগিটি এখনো বর্ত্ত-মান। কিন্তু এ সময়ের প্রধান প্রাণী স্থূলচর্ম্মী স্তন্য-পায়ী, এখন লোপ পাইয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল মাত্র এখন অবশিষ্ট। তাহারা এ সময়ে যেমন অসংখ্যক তেমনি অদ্ভুদাকার ও বৃহদায়তন।

এ সময়ের এক রকম প্রকাণ্ড অদ্ভুত স্থূলচর্ম্মী জন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া প্রাণীবেত্তারা তাহার নাম ভয়ঙ্কর জীব (Dinotherium) রাখিয়াছেন। ইহার আকার অনেকটা হস্তীর ন্যায়, কিন্তু হস্তী হইতে ইহা অনেক প্রকাণ্ড, এবং ইহার নিম্নের দন্তস্তর হইতে দুইটি দন্ত মহিষশৃঙ্গের ন্যায় নিম্নে বক্র হইয়া নির্গত। ইহা দেখিতে যদিও ভয়ানক, কিন্তু শস্যাহারী। এই সময়ের হস্তীজাতীয় আর এক রূপ স্থূল-চর্ম্মীকে মাশটডন (অর্থাৎ স্তননিভাকার দন্ত বিশিষ্ট)

যুগে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর স্থলরূপে আমেরিকা ও ইয়ো-রোপকে সংযুক্ত রাখিয়াছিল।

কহা যায়। ইহাদের বাহ্য আকার অনেকটা হাতীর মত, তবে হাতী অপেক্ষা ও ইহারা স্থূলচর্ম্মী এবং লম্বা। ইহাদের কসের দাঁতের বিভিন্ন গড়নই আধুনিক হস্তী হইতে ইহাদিগকে বিশেষ রূপে ভিন্ন করিয়াছে।

পেনসিলভেনিয়া ইউনিভারসিটির অধ্যাপক বারটন, খড়ি মৃত্তিকাস্তরের ৬ ফুট নীচে যে মাশ্‌টড়ন কঙ্কাল পাইয়াছিলেন, তাহার একটি দন্ত সতের পাউণ্ড ওজনে হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীরা ইহাকে বৃষের পিতা বলে। ফাব্রি নামে এক জন ফরাসী, প্রাণী-বেত্তা বুফঁকে লেখেন, ক্যানেডা এবং লুইশিয়ানা প্রদেশে যেখানে মাশটডন কঙ্কাল প্রচুর পাওয়া যায় সেই প্রদেশ-বাসীদের প্রত্যেক শ্রুতিপরম্পরায় ও পুরাণ গানে এই জন্তুর কথা উল্লিখিত। তাহাদের একটি গানে আছে যখন মনিটর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে নামিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জন্তু সকল, কে কেমন সুখে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বাইসন অর্থাৎ আমেরিক মহিষ বলিল, "ঐ ভয়ানক বৃষপিতা পর্ব্বত হইতে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে নামিয়া আমাদের কখন খাইতে আসেন তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিতে হইলে আমরা এই তৃণ-পূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে পাইয়া সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারিতাম" আমেরিকার চৈন নামক প্রাচীন জাতির একটি প্রবাদ যে, পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড জন্তুরা, তাহাদের সমান প্রকাণ্ডাকার মনুষ্যের সহিত বাস করিত।

কিন্তু ঈশ্বর অনবরত বজ্রাঘাত দ্বারা সেই সকল মানুষ ও জন্তু এক কালে বিনাশ করিলেন। বর্জ্জিনিয়ার আদিম অধিবাসীদের আবার অন্যরূপ গল্প আছে। তাহারা বলে, এই ভয়ানক জন্তু অন্য জন্তুদের বধ করিত বলিয়া ঈশ্বর বজ্র দ্বারা সকলকে বিনষ্ট করিলেন, কেবল একটি মাত্র পুং মাশটডন বজ্র পড়িবার সময় মস্তক নাড়িয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু পালাইবার সময় গাত্রে বজ্র পতন দ্বারা আহত হইয়া যে হ্রদে সে লুকাইয়াছিল সেই খানেই মরিয়া যায়। এই সকল গল্প হইতে মনে হয় মাশটডন, মামথ হস্তীর সমকালীন। হয় আদিম মনুষ্যে ইহা দেখিয়াছে, কিম্বা ঠিক মনুষ্য জন্মাইবার আগেই ইহা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক ইহা যে মানুষ-জন্মের বহু কাল পূর্ব্বে নহে তাহা এই সকল গল্প হইতে প্রকাশ পায়। এই মাশটডন হস্তী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক সত্য গল্প আছে। রোন নদীর বাম পার্শ্বে ডফিনি প্রদেশে সোমঁ নামক দুর্গের সন্নিহিত বালুকা স্তর খুঁজিতে খুঁজিতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের ১১ ই জানুয়ারিতে সেই খননকারী লোকেরা একটি হস্তীর কতকগুলি অস্থি পায়। তখন এইরূপ পুরাতন জন্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। সেই দেশীয় মাজুইয়ার (Mazuyer) নামক একজন চিকিৎসক এই অস্থি সকল কিনিয়া রটনা করিলেন যে টিউটবকাশ রাজার (Teutobocchus Rei); নামাঙ্কিত ৩০ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া

একটি কবরে তিনি এই অস্থি সকল পাইয়াছেন এবং আরো বলিলেন যে সেই কবরস্থিত মারিয়াস (Marius) মূর্ত্তি অঙ্কিত পঞ্চাশ মুদ্রা তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে।

টিউটোবোকস কিম্বি নামক প্রাচীন জর্ম্মান জাতির সেনাপতি হইয়া গল আক্রমণ করিতে গমন করেন এবং প্রেভেন্স প্রদেশের আই নামক নগরে রোমীয় সেনাপতি মারিয়াস কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া রোমে আনীত হয়েন। মাজুইয়ার ২৫ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া একটি অস্থি দেখাইয়া বলিলেন ইহাই মৃত টিউটোবকাসের দেহাবশেষ। তিনি এই মিথ্যা টিউটোবকাসের দেহ ফ্রান্স ও জার্ম্মনির প্রায় সর্ব্বত্রই প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত কঙ্কাল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এই কঙ্কাল লইয়া মহা বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। শারীর তত্ত্ব-বিদ রিয়োল্যাঁ টিউটোবোকাসের এই দেহ হস্তীকঙ্কাল ছাড়া কিছুই নহে এই প্রমাণ করিবার জন্য হরবিকট নামক এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পরস্পর মহা লেখনী-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গাসেনডি (Gassendi) বলিয়া আর এক জন পণ্ডিত প্রমাণ করিলেন যে মারিয়সের মূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রাও মাজুই-য়ারের প্রবঞ্চনা, কেন না সে মুদ্রায় গথিক অক্ষর অঙ্কিত।

এই মিথ্যা টিউটোবোকাস-দেহ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোর্দোঁতে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে ইহা পারিসের মিউজি-

য়ামে প্রেরিত হয়। ব্যাঁভিল ইহা দেখিয়া মাশটডন অস্থি স্থির করেন। এবং যাহারা এ অস্থি একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা মনুষ্যকঙ্কাল বলিয়া ভ্রম হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক।

এই অন্তরযুগেই প্রথম বানরের জন্ম। এখনকার কাঁকড়া, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি জীব মায়োসিন সমুদ্রে প্রথম জন্মে।

এই যুগের কয়লার আর এক অপরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হলদে ধূনা, Amber।

তৃতীয় যুগের লুপ্ত দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ নির্যাস অনেক-দিন ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া এইরূপ আকরিক ধূনা হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দম মধ্যস্থিত এই ধূনা বল-টিক-সমুদ্র-তরঙ্গ-ধৌত হইয়া কূলে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইহা দ্বারা বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ফৈনিসিয়েরা বাণিজ্যার্থে এই ধূনা কুড়াইতে বল-টিক সমুদ্র-তীরে আরোহণ করিত। এখন গবর্ণমেণ্ট ইহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। এই ধূনা এখন প্রধানত ডান্‌ৎসিক ও মেমেলের মধ্যস্থিত জর্ম্মান উপকূলে প্রাপ্তব্য। অন্য মূল্য ছাড়া ইহার একটি বিশেষ মূল্য এই, তৃতীয় যুগের যে সকল প্রকার কীট পতঙ্গ দেহ ইহাতে রক্ষিত, তাহাদের বর্ণ এবং আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

মায়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশের পেগু, আসাম ও সিন্ধুর কতকাংশ এবং মারি প্রদেশ উৎপন্ন।

প্লায়োসিন অন্তর যুগ।

তৃতীয় যুগের এই শেষ অন্তরযুগে বিষম বিপ্লব চিহ্ন পাওয়া যায়। সকল সময়ের বিপ্লবের যে কারণ ইহারও তাহাই। ভূগর্ভ শীতল হইয়া এই সময় এত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, যে কঠিন-ভূপৃষ্ঠ নিম্নে নির্ভর না পাইয়া তুবড়াইয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল, এবং কোন কোন স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর-নিঃসৃত আভ্যন্তরিক দ্রব পদার্থ পর্ব্বতমালায় পরিণত হইল। প্লায়োসিন অন্তর যুগের এই রূপ উৎপাত-জনিত পর্ব্বতমালা ইয়োরোপে অনেক দৃষ্ট হয়। এই অন্তর যুগে হঠাৎ শীতের প্রাধান্য দেখা যায়। এখন পর্ব্বত-চূড়া তুষারাচ্ছন্ন, দেশ মহাদেশ এই সময় হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই অন্তর যুগের অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদ এখন শুষ্ক। এই সময়ের উদ্ভিদ প্রায় ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মত। পর্ণীতরু জাতির এখন আর আধিক্য নাই। শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন দেশে এখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। ইয়োরোপে আর গ্রীষ্ম দেশের বৃক্ষের তত প্রাচুর্য্য নাই। এ অন্তর যুগেও নানা প্রকার অদ্ভুত স্থলচর জন্তু দেখা যায়। তবে এ

সময়ে স্তন্যপায়ী এবং ভেকজাতীয় সরীসৃপেরই প্রাধান্য অধিক। এ অন্তর যুগের শেষ ভাগে মাষ্টডন আর বড় দেখা যায় না। এ যুগের নূতন উৎপন্ন জন্তুর মধ্যে, জল-হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব বৃষ শূকর ও হরিণ এখনো বর্ত্তমান। এ অন্তর যুগের অশ্ব আধুনিক জাতি অপেক্ষা আকারে ছোট ইহা প্রায় গর্দ্দভের সমান।

এখন নানা জাতীয় অসংখ্য বানর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে গণ্ডারের প্রথম উৎপত্তি, এ সময়ে তাহার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সময় একরূপ দ্বিখড়্গী গণ্ডার (Rhinoceros tichorhinus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুমাত্রা ও আফ্রিকার আধুনিক দ্বিখড়্গী জাতি হইতে অনেক ভিন্ন। ইহাদের নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে একটা হাড়ের ব্যবধান আছে, আধুনিক জাতিতে তাহা নাই।

এই পুরাতন অদ্ভুত-গণ্ডার-কঙ্কাল হইতে নানাবিধ অদ্ভুত গল্পের উৎপত্তি। আরব্য উপন্যাসে যে রূপ পক্ষীর গল্প পড়া যায়, ভূগর্ভে এই গণ্ডার শৃঙ্গ পাইয়াই সেই অদ্ভুত পক্ষীর গল্প সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরোপের বিখ্যাত ড্র্যাগনের গল্পও ইহা হইতে সৃষ্ট। ক্যারিনথিয়া প্রদেশের ক্ল্যাগেনভূর্থ নগরের ফোয়ারায় প্রকাণ্ড ৬ ফুঠ পরিমাণ এক-শৃঙ্গ-ড্র্যাগন মস্তক অঙ্কিত আছে। প্রবাদ এই যে, এই ড্রাগন পূর্ব্বে এক পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নির্গত হইয়া দেশ ছারখার করিত। এক সাহসী বীর নিজ-

প্রাণ দিয়া এই ড্র্যাগনকে হত্যা করেন। ক্লাগেনভূর্থের টৌন-হলে রক্ষিত এই ড্র্যাগনমস্তক হইতে শেষে ফোয়ারায় তাহার অনুরূপ অঙ্কিত হয়। বিয়েনার হের উঙ্গের (Herr unger) এই মস্তক-চিত্র দেখিবা মাত্রেই গণ্ডার মস্তক বলিয়া চিনিতে পারেন। কোন পর্ব্বত-গুহায় এই মস্তক পাইয়া হয় তো এই অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল।

হিমালয়ের মার্কণ্ড উপত্যকায় এই সময়কার এক রূপ অদ্ভুত রোমন্থনকারী জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা শিবের নাম হইতে ইহার নাম শিবথেরিয়াম রাখিয়াছেন। ইহার শরীর বৃষের ন্যায় প্রকাণ্ড, এবং আকারে অনেকটা আধুনিক (Elk) এল্ক জাতীয় হরিণের মত। ভিন্ন ভিন্ন শষ্যাহারী-জন্তুর অবয়ব মিশ্রন সত্বেও ইহার একটি নিজত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বৃহৎ মস্তকে বর্ত্তমান সময়ের এক-জাতীয় আমেরিক হরিণের (Prong Buck) শৃঙ্গের মত শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট চারিটি শূন্যগর্ভ শৃঙ্গ।

বর্ত্তমান কালে জীবিত ভেক জাতীয় উভচর সরীসৃপ (যথা, গোসাপ ইত্যাদি) ২০ ইঞ্চের অধিক দীর্ঘ নহে। কিন্তু তৃতীয় যুগে এই জাতীয় এক একটি সরীসৃপ কুম্ভীরের ন্যায় দীর্ঘায়তন ছিল।

পূর্ব্বে এই সকল সরীসৃপকঙ্কালকে চতুর্থ যুগের বন্যাহত মনুষ্যকঙ্কাল বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রম

বিশ্বাসটি ঘুচাইবার জন্য ক্যাঁপে ও কুভিয়ের অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

হরেশ দে সোস্যর (Horace de Saussure) তাঁর আল্প পরিভ্রমণ (Voyage dans les Alpes) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে রাইন নদীর বাম পার্শ্বে ইনিংগেন গ্রামের নিকটে এক স্থানে প্রস্তর-তলে একটি কঙ্কাল পাইয়া মনুষ্য-কঙ্কাল বোধে শ্যুকজার (Scheuchzer) নামক এক জন সুইশ প্রাণীবেত্তা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজ্যাকসন পত্রিকায় ইহার বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। এবং ১৭৩১ খৃঃ অব্দে তিনি আবার এই সম্বন্ধে "মনুষ্য বন্যার" সাক্ষী (Homo deluvii testis) নামক এক খানি পুস্তক লেখেন। পবিত্র ভৌতিক বিদ্যা (Physica,Sacra) নামক তাঁহার আর একখানি পুস্তকেও ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

"মনুষ্য বন্যার সাক্ষী" এই কথা লইয়া জার্ম্মনিতে মহা হুলস্থূল চলিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ ধর্ম্মউপদেষ্টা ও প্রাণীবেত্তা সুইজ পণ্ডিত সুকিজারের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না—কেবল পিয়ার ক্যাঁপার একাকী এই মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নিজে এনিংগেন (O Eningen) পর্য্যন্ত গিয়া এই কঙ্কাল পরীক্ষা দ্বারা সরীসৃপকঙ্কাল বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু ইহা

কোন জাতীয় সরীসৃপ তাহা ক্যাঁপার ঠিক ধরিতে পারেন নাই; কুভিয়ে পরে সে মীমাংসা করিলেন। এ যুগের পক্ষীর মধ্যে শকুনি, ঈগল গল, ছাতারি শুকজাতীয় ফেজ্যাণ্ট কুক্কুট, হংস, ইত্যাদি এখনো জীবিত।

এই সময়ে প্রথম আমরা জলচর স্তন্যপায়ী দেখিতে পাই, ডলফিন এবং তিমি মৎস্য এই সময়ে জন্মে। জিফি-উস (Ziphius) বলিয়া আর একরূপ জলচর-জীবদের কুভিয়ে স্তন্যপায়ী জলচর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ভূমধ্য সাগরে এই জাতি এখনো বর্ত্তমান। এই সময়ে বহু-সংখ্যক নূতন শম্বুক জাতীয় জীব জন্মে এবং পৃথিবী ফলতঃ আধুনিক আকারে পরিণত হয়।

ভূ-পঞ্জর।

সপ্তম অধ্যায়।

চতুর্থ প্রস্তাব।

তৃতীয় যুগের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া এখন পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ চলিয়া আসিতেছে। দুএকটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা ছাড়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এযুগে দৃষ্ট হয় না। বন্যা এবং হিমশৈলের কার্য্যই এযুগের বিশেষ লক্ষণ, এবং ইহা অপেক্ষাও এ যুগের আর একটি বিশেষ লক্ষণ মনুষ্যের উৎপত্তি। এই যে তিনটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে এই যুগটি ভিন্ন তাহাদের পর্য্যায় এইরূপ—

প্রথম—ইয়োরোপীয় বন্যা ;

দ্বিতীয়—হিমশৈলের কার্য্য ;

তৃতীয়—মনুষ্যের উৎপত্তি এবং আসিয়ার বন্যা ;

চতুর্থ যুগের এই ঘটনাত্রয় বর্ণনা করিবার অগ্রে ইয়োরোপীয় বন্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ভূবেত্তাগণ চতুর্থ-

যুগকে দুইভাগে ভাগ করেন, প্রথম প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী বা চতুর্থ যুগের প্রারম্ভকাল ; দ্বিতীয় আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষাংশ আধুনিক কালেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি ঘটনার জন্ম।

প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী কাল।

(Post Pliocene Period)

এই সময়ের উদ্ভিদের কথা বলা এখন বাহুল্য। চতুর্থ যুগের প্রারম্ভের ও আধুনিক সময়ের উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ জাতিভেদ লক্ষিত হয় না। জন্তু সম্পর্কেও সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে। তখনকার তিনচারি জাতীয় জীব মাত্র এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ; এবং পরে শীতাতপ বৈষম্য হেতু স্থান বিশেষের জন্তুবিশেষ লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় জন্তু পৃথিবীর অন্যত্র বর্ত্তমান।

চতুর্থ যুগের প্রারম্ভেও ইয়োরোপ যে, সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি গ্রীষ্ম দেশীয় জন্তুর নিবাসভূমি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ধীবরেরা শুক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া কেবল মাত্র নরফোক তীরে আঠার হাজারেরও অধিক হাতীর কষের দাঁত উঠাইয়াছিল। হস্তীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে যেরূপ সময় সাপেক্ষ তাহাতে এই বহু সংখ্যক দন্ত জমিতে নিশ্চয়ই বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।

আমেরিকাতে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে মিগেথেরিয়াম (১) মিগেলনিক্স্ (২) মাইলডন (৩) গ্লিপটোডন (৪) বলিয়া যে সকল জন্তু ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের ঐরূপ পুরাতন লুপ্ত জন্তুর কঙ্কাল যদিও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই তথাপি বোধ হয় এখানেও ঐরূপ অনেক পুরাতন জাতির লোপ হইয়াছে। মকর বলিয়া আমরা পুরাতন গ্রন্থে যে জলজন্তুর উল্লেখ পাই, উহা যে কেবল মাত্র কল্পনাসম্ভূত জীব তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? হয়তো সত্য সত্যই ঐরূপ কোন প্রকার জীব পুরাকালে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।

মামথ বলিয়া একরূপ হস্তী এই সময় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ছিল, তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে; ইহা আধুনিক বৃহত্তর হস্তী হইতেও প্রকাণ্ড! দন্তের গঠন প্রভেদ হেতুই মাশ্টডন হইতে মামথ ভিন্ন। মামথের দন্তবিন্যাস আমাদের হস্তীর ন্যায়। এই হস্তীর কঙ্কাল পুরাতন কালে কেহ বা দেবতার কেহবা রাক্ষসের দেহাবশেষ বলিয়া মনে করিত। গ্রীকগণ এই হস্তীর একটা জানুর অস্থিকে গ্রীকযোদ্ধা এ-জ্যাক্সের (Ajax) জানু-অস্থি ভাবিয়াছিল এবং এইরূপ কোন

১ Megatherium অর্থাৎ প্রকাণ্ড জীব।
২ Megalouyse অর্থাৎ লম্ব-নখর।
৩ Mylodon অর্থাৎ জাগদন্ত।
৪ Glyhtodon অর্থাৎ খোদিত দন্ত।

অস্থি হইতেই এজক্‌স্‌পুত্র অ্যাষ্টেরিয়াস্ (Asterius) এবং আরো সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড শরীরী মনুষ্যের গল্প নির্ম্মিত।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মধ্য-যুগে-(Middle. ages) রচিত Gigantology বলিয়া প্রকাণ্ড শরীরীদিগের যে বিবরণ পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অদ্ভুত গল্প সন্নিবেশিত; সে সকলই যে এইরূপ হস্তী-কঙ্কাল হইতে উৎপন্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। স্পেনের ইতিহাসেও এইরূপ অনেক গল্প পাওয়া যায়। ক্রিষ্টফার নামক সেণ্টের একটি দাঁত বলিয়া ভেলেন্সের গির্জায় যে অস্থি রক্ষিত আছে তাহা ঐ হস্তীর কষের দাঁত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃষ্টি কামনায় সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট গির্জ্জার পাদরিরা যে একটা কল্পিত রাক্ষসের হাত স্কন্ধে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ প্রকাণ্ড হস্তীর পার্শ্বাস্থি (Femur) মাত্র। ফ্রান্সেও এইরূপ অনেক গল্প প্রচলিত।

১৮ শ শতাব্দীতে মামথ হস্তীর কঙ্কাল ইয়োরোপের নানা স্থানে পাওয়া যায়। প্রথমে লোকের বিশ্বাস ছিল ইহা আধুনিক হস্তীর কঙ্কাল। কোন কোন বিদ্যাভিমানী বলিতেন হানিবল, ইটালি আক্রমণ কালে, এই সকল, হস্তী কার্থেজ হইতে লইয়া আইসেন। ইহার ভ্রম সপ্রমাণ করিতে কুভিয়ের অল্পই প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইয়োরোপ, আমেরিকা, আসিয়া ও আফ্রিকার সকল স্থানেই এইরূপ হস্তী-কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

লেনানদীর মোহানায় নূতন সাইবিরিয়া ও লাচৌ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশস্থান বালি, তুষার ও হস্তিদন্তময়। প্রত্যেক ঝড়ে সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে যে সকল মামথ হস্তি-দন্ত তীরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা দ্বারা তদ্দেশবাসীদের লভ্যজনক বাণিজ্য চলে। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে অসংখ্য যাত্রী, নৌকাপথে এই অস্থি-দ্বীপাভিমুখে গমন করে এবং প্রত্যেক শীতকালে অসংখ্য কুক্কুর-শকট, হস্তি-দন্ত-পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। এক একটি দন্তের ওজন ৫০ হইতে ১০০ মন পর্য্যন্ত। ৫০০ বৎসর ধরিয়া চীনেরা এই দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাণিজ্যের নিমিত্ত হস্তি-দন্ত আহরণ করিতেছে। এবং ১০০ বৎসর ধরিয়া ইহা ইয়োরোপে ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইতেছে তথাপি ইহার এখনো শেষ নাই। এই অপরিমেয়, অস্থি-রাশি স্তূপীকৃত হইতে কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসরই লাগিয়াছে !

সাইবীরিয়-ভাষা হইতেই এই হস্তীর নাম মামথ হইয়াছে। বিখ্যাত রুসিয় পণ্ডিত প্যালাশ যিনি প্রথমে মামথের রীতিমত বর্ণনা করেন তিনি বলেন তাতারেরা পৃথিবীকে মামা কহে, এই মামা হইতে মামথ উৎপন্ন, মামথ অর্থাৎ পৃথিবী-বিবরবাসী। অন্য মতে, আরবিক মেহিমথ হইতে মামথ উৎপন্ন, মেহিমথ অর্থাৎ অসাধারণ আকার। আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনের মধ্যেও এই সকল

জন্তু বিবর-বাসী বলিয়া প্রবাদ, চীনে ইহাদের নাম টিয়েন-সিউ অর্থাৎ যাহারা মাটীতে লুকায়।

এই সময়ে উৎপন্ন হিমালয়ের নিম্নস্তরে কয়েকটি কচ্ছপদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার উদর-নিম্নস্থ কঠিন-আচ্ছাদনী-অস্থি বার ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া; এবং পায়ের হাড় গণ্ডারের ন্যায় দৃঢ় ও প্রকাণ্ড।

এই সময়ের নানা প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তুর কঙ্কাল ইংলণ্ডের ইয়র্ক সায়ারস্থ বিখ্যাত কার্কডেল গহ্বরে এবং ডিবন সিয়ারে টর্কির নিকটস্থ কেন্ট গহ্বরে পাওয়া গিয়াছে। এই গহ্বরে আবিষ্কৃত কঙ্কালরাশি হইতে কত অনুমানই উত্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। সাধারণত এই বিশ্বাস ইহা কোন মাংসাশী পশুর গহ্বর, এবং সেই মাংসাশী পশু কর্তৃক আনীত অন্যান্য পশুদের দ্বারা গহ্বর পূর্ণ। কেহ কেহ আবার বলেন রুগ্ন অসমর্থ পশুগণ শত্রুর হাত এড়াইতে এই ভয়শূন্য গুহায় আসিয়া মরিত; অপর কেহ বলেন বন্যাতে মৃত পশুর কঙ্কাল ভাসিয়া এই গুহায় আসিয়া জমিয়াছে। যে অনুমানটিই সত্য হউক না কেন ইহা নিশ্চয় যে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে এই সকল পশু ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা দেশে এখন যেরূপ বৃহৎ জল-হস্তী আছে সেইরূপ জল-হস্তী, দ্বি-খড়্গী-গণ্ডার, নানা জাতীয় হরিণ, বৃষ, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, ভল্লুক, সিংহ, হায়েনা, বিবর, প্রভৃতি যে সকল জন্তুর

মধ্যে অধিকাংশই এখন ইংলণ্ডে নাই তাহা তৎকালে ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। তখন ভল্লুক জাতীয় একরূপ হিংস্রক জন্তু ছিল তাহা সিংহ ব্যাঘ্র হইতেও ভয়ানক। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ইয়োরোপস্থ চতুর্থ যুগের এই সকল পশু কেমন করিয়া হঠাৎ লোপ পাইল ?

কুভিয়ে এবং পুরাতন ভূবেত্তারা বলেন হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা দ্বারা একেবারে এই সমস্ত পুরাতন জন্তু বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ভূবেত্তাগণের মতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই এই সকল জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে, হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা বশত নহে। ক্রমশঃ শীতের আধিক্যই এই বিনাশের প্রধান কারণ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োসিন অন্তরযুগে ইয়ো-রোপে তাল, নারিকেল ইত্যাদি গ্রীষ্মদেশীয় বৃক্ষ প্রচুর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তরযুগে ইয়োরোপ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে শীতাক্রান্ত হইয়াছিল; পরে প্লায়োসিন অন্তর-যুগে ইয়োরোপ আরো শীতল হইল, সেই সময় এখানে চতুর্থ যুগের ভাবী শীতের লক্ষণ দেখা দিল। এইরূপে ক্রমশই ইয়োরোপের উত্তাপ হ্রাস হইয়া ভীষণ শীত-প্রভাবে চতুর্থ যুগে ক্রমে হিমশৈলের কার্য্য আরম্ভ হইল।

হিমশৈলের পূর্ব্বে ইয়োরোপে যে মহাবন্যা হইয়াছিল, সেই সমুদ্র-বন্যায় ধৌত নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা

দ্বারা ইয়োরোপের স্থানে স্থানে যে স্তর-সংস্থিতি হইয়াছে সেই স্তর-সংস্থিতির পরে ইয়োরোপের উত্তাপ একেবারে কমিয়া একটি ভয়ঙ্কর শীতকাল আসিয়া পড়িল, সেই শীতকালকেই হিমশৈল কাল বলা যায়। এই সময় ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ এবং সম্ভবতঃ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও একটি ঘন হিমশৈল-আবরণে আবৃত হয়। ইংলণ্ডে ব্রিশটল চ্যানেলের দক্ষিণে একটি ভূখণ্ড এবং টেম্‌শ নদী-গর্ভ মাত্র তখন জলের উপরি ভাগে ছিল। ইংলণ্ডের উত্তরাংশ এবং ব্রিটনের উচ্চভাগ ও আয়ারলণ্ড এই হিমশৈল চালনে পেষিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সুদূরব্যাপী বন্যার প্রভাবে টেম্‌শ নদীর উত্তর দিক যে সেই সময় হইতে ক্রমশঃ সমুদ্রগ্রস্ত হইতে আরম্ভ হইল ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। র‍্যামজে প্রমাণ করেন ভীষণ শীতের প্রারম্ভে ইয়োরোপের স্থল ভাগ এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল; তাহার পর, বন্যা আসিয়া ইয়োরোপের অধিকাংশ স্থল সমুদ্রমগ্ন করিয়াছিল, পরে আবার তাহা সমুদ্র হইতে উঠিয়া হিমশৈল আবৃত হইল।

আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষ ভাগ বর্ত্তমানকাল তিন ভাগে বিভক্ত।

১। ইয়োরোপের বন্যা,

২। হিমশৈলকাল,

৩। মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা।

ইয়োরোপীয় বন্যা।

ইয়োরোপের অনেক স্থানে তৃতীয় যুগের স্তরের উপরে নানা জাতীয় মৃত্তিকামিশ্রিত স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইয়োরোপ-সন্নিহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মৃত্তিকাই এই স্তরে প্রচুর। ইয়োরোপস্থ পাহাড়-নিম্নের ক্ষয়-গ্রস্ত, খোদিত ও বিস্তৃত উপত্যকা-ভূমি এবং স্থানে স্থানের স্তরীভূত মসৃণ গোলাকার কঙ্কররাশি দেখিলে তাহার উপর অনবরত জল ঘর্ষণ-কার্য্য লক্ষিত হয়। এই সকল কঙ্কররাশি প্রবল বন্যাপ্রভাবে ধৌত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা দেখিলে মনে হয় সমুদ্রের একটি মহা তরঙ্গ, স্থল-পৃষ্ঠে পড়িয়া সমস্ত চুরমার করিয়া দূরদূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ভীষণবন্যানিক্ষিপ্ত পদার্থরাশির স্তরকে বন্যাসম্ভূত স্তর বলা যায়।

সহসা এই ভয়ঙ্কর বন্যাস্রোত আসিয়া ইয়োরোপ আক্রমণ করিল কেন? সম্ভবতঃ ইয়োরোপের সমুদ্রগর্ভে কিম্বা এই সমুদ্রসন্নিহিত ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক অগ্নির কার্য্যবশতঃ কোন ভূখণ্ড উচ্চ হইয়া উঠিবার সময় সমুদ্র-আন্দোলন দ্বারা এই রূপ বন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল।

এই ভূখণ্ড উঠিবার সময় তরঙ্গিত-সমুদ্র-জল-রাশি ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া দেশ, মহাদেশ, উপত্যকা, ছারখার করিয়া দেয়। অগ্নি-সম্ভূত (volcanic) পর্ব্বত কিম্বা পর্ব্বতমালা যেমন হঠাৎ নির্ম্মিত হয় এই বন্যা তেমনি সহসা হইয়াছিল; একবার হইয়াই ইহা ক্ষান্ত হয় নাই, এইরূপ বন্যা যে এক সময়ে একের অধিক বার ইয়োরোপ আক্রমণ করিয়াছিল এই মহাদেশের অনেক স্থানের স্তরসংস্থিতি তাহার সাক্ষী।

এই স্তর-সংস্থিতিই যে ইয়োরোপের বন্যার কেবল মাত্র সাক্ষী এমন নহে, স্বস্থানবিচ্যুত আকরিক পদার্থের চাপড়াও এই বন্যার একটি বিশেষ প্রমাণ।

চতুর্থ যুগের এই বন্যার পূর্ব্বে অন্যান্য যুগেও যে এইরূপ অনেক বন্যা হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরিক উত্তাপের হ্রাস বশতঃ ভূগর্ভ শীতল হইয়া হ্রস্বায়তন হইলে ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া সকল যুগেই প্রায় পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালা উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ পর্ব্বত সৃষ্টি হইবার সময় প্রত্যেকবার ভূগর্ভ আন্দোলন হেতু সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া বন্যা উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ যুগের বন্যার যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এমন আর কোন যুগের বন্যার নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চতুর্থ যুগে দুই সময়ে দুইটি বন্যা হয়, প্রথম, ইয়োরোপীয় বন্যা, দ্বিতীয়, আসিয়ার বন্যা।

ইয়োরোপ এক সময়ের মধ্যে দুইবার বন্যাক্রান্ত হয়। নরওয়ের পর্ব্বতমালা সৃষ্ট হইবার সময় ইয়োরোপের প্রথম বন্যা আরম্ভ। স্ক্যানডিনেবিয়ায় বন্যা উত্থিত হইয়া সুইডেন নরওয়ে ইয়োরোপ-রুসিয়া এবং জার্ম্মানির উত্তরের সমস্ত স্খলিত মৃত্তিকা একত্রে জলমিশ্রিত হইল।

ভূগর্ভের অগ্নির প্রভাবে এই জলমধ্য দিয়া নরওয়ের পর্ব্বতমালা উঠিতে লাগিল। মেরুসন্নিহিত বন্যাজলরাশি হিম-শৈলাকার ধারণ করিল, বন্যা-তরঙ্গে সেই হিমশিলার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া কর্দ্দম, কঙ্কর ইত্যাদির সহিত অন্যত্রে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সেই হিম-শিলার দারুন আঘাতে মৃত্তিকা আরো সবলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল।

উত্তর ইয়োরোপের সম-ভূমি ও নিম্ন ভূমিতে যেরূপ বিপর্য্যস্ত সমূহ দেখা যায় তাহাই উত্তর ইয়োরোপের এই বন্যার প্রাকৃতিক প্রমাণ। এই লণ্ড ভণ্ড মৃত্তিকাস্তরে (Utstratified Doposits) যে সকল চাপড়া (Block) পাওয়া যায় তাহা সাধারণত বৃহদায়তন। যে বন্যা-ভঙ্গ গ্রেনিট চাপড়ার উপর রুসিয়ার সেন্ট পিটর্‌স্‌বর্গে পিটরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান তাহা অত্যন্ত প্রকাণ্ড।

জর্ম্মণি পোলণ্ড এবং ব্রিটেনের মধ্যে নরোয়ে দেশউৎপন্ন প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড দেখিয়া বোধ হয় তাহারা নিশ্চয়ই বন্যা দ্বারা আনীত।

উত্তর প্রুসিয়ায় ৩৪০ টন ওজনের একটি এই জাতীয় গ্রেনিট চাপড়া পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রকাণ্ড-প্রস্তর, নরোয়ে হইতে উক্ত সকল দেশে আনিতে কতই না জানি বলের আবশ্যক হইয়াছিল!

আল্প পর্ব্বত শ্রেণীর কোন কোন অংশ উঠিবার সময় ইয়োরোপের দ্বিতীয় বন্যা হয়। আলপের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ যথা, ফ্রান্স, ইটালি, জারমানির উপত্যকাভূমি এই বন্যা-নিক্ষিপ্ত পদার্থরাশিতে পূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত বন্যা হইতে ইহা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বাংশে প্রাণী-দেহ-সঙ্কুল প্রথম যুগের স্তর এবং ওয়োলাইট ক্রিটে-সস, এবং তৃতীয় যুগেরও স্তর দেখা যায়—কিন্তু মধ্য আল্পে এ সকল কিছুই দেখা যায় না, এস্থানে অপেক্ষা-কৃত আধুনিক ইয়োসিন মৃত্তিকার অনেক স্থান রূপান্তরিত দেখিয়া মনে হয় এ সময়ে ক্রমাগত ভূগর্ভ হইতে নূতন নূতন উৎপাত বশতঃ নূতন মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উৎপাত বশতই ইয়োরোপে বন্যার দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিমশৈল কার্য্যকাল।

প্রাণী-জগৎ যখন উন্নতির শেষ সোপানে উঠিতে যত্নবান তখন সহসা উপরি উপরি পূর্ব্বোক্ত দুই বন্যা দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপ জলমগ্ন হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগতেরও

উন্নতির পদে কণ্টক পড়িল ; এই বিপদ না সামলাইতে সামলাইতে আর একটি বিপদ আসিয়া ইয়োরোপের পুরাতন প্রাণীদের আর উঠিতে দিল না।

স্কান্‌ডিনেবিয়া হইতে ভূমধ্যসাগর ও ড্যানুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অর্থাৎ মধ্য ও উত্তর ইয়োরোপে সহসা একটি অভূতপূর্ব্ব অসাধারণ প্রচণ্ড শীতকাল দেখা দিল, মেরুপ্রদেশের শীত সহসা ইয়োরোপে উপস্থিত। ইয়োরোপের গ্রীষ্ম-দেশীয় সুন্দর বৃক্ষাদি দ্বারা সজ্জিত শ্যামল ক্ষেত্র, যাহাতে আসিয়া ও আফ্রিকার বৃহৎ হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব প্রভৃতি পশু বিচরণ করিত সেই সকল ক্ষেত্র সহসা দারুণ শীতে হিমশৈলাবৃত হইয়া পড়িল। বহমান নদীর পরিবর্ত্তে জমাট নীহাররাশি বহিতে লাগিল। বেগে বহমান এইরূপ নীহারনদীর ঘর্ষণে চতুঃপার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কি ভয়ানক রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহা অনুভব করাও দুষ্কর। এই দারুণ শীতের অখণ্ডনীয় কারণ এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই।

শীত গ্রীষ্ম ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ সূর্য্যোত্তাপ, সেই নিমিত্ত সহসা সূর্য্যের উষ্ণতার হ্রাস না হইলে আর এরূপ শীত আসিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু হঠাৎ সূর্য্যোত্তাপ হ্রাস হইবার কি কারণ হইতে পারে ?

এ সম্বন্ধে একটির অধিক আনুমানিক মত বাহির হইয়াছে কিন্তু কোনটিই ইহার নিশ্চিত কারণ বলিয়া স্থির হয় নাই।

সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত রশ্মির সমস্ত, আকাশে বিকীর্ণ হইতে পায় না, সূর্য্যের বাষ্পাবিরণ ভেদ করিয়া আসিবার সময় অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক বাষ্পাবরণে লীন হইয়া যায়, ইহা হইতে অধ্যাপক ল্যাংলি বলেন সেই সময়ে সূর্য্যরশ্মি এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্পাবরণে লীন হইয়াছিল বলিয়াই এই দুরন্ত শীতের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু অ্যাডহিমার এই প্রচণ্ড শীতকাল সম্বন্ধে যে জ্যোতিষিক কারণ অনুমান করিয়াছেন তাহা উহা অপেক্ষাও যুক্তিসিদ্ধ।

এখন পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে বলিয়া, সেখানে শীতের প্রভাব অধিক, এবং উত্তরার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্যের নিকটস্থ হয় বলিয়া এখানে অপেক্ষাকৃত শীত কম। উত্তরার্দ্ধে শীতকালে যে পরিমাণে হিমশিলা জন্মে গ্রীষ্মকালে তাহার অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়; দক্ষিণে অধিকাংশ স্থান চিরতুষারাবৃত; হিমশৈলের কার্য্য দক্ষিণে অধিক বলবান। সুমেরু পৌছিবার আশা আছে কুমেরু পৌছিবার আশা নাই। কিন্তু ক্রান্তিপাতের বক্র গতি দ্বারা ১০০০০ বৎসরে পৃথিবীর উভয়ার্দ্ধ সূর্য্য সম্পর্কে তাহার অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করে, উত্তরার্দ্ধ শীতকালে যদি আজ অয়নমণ্ডলের নিকট-প্রান্তে থাকে, আর ১০০০০ বৎসরে তাহা শীতে দূরপ্রান্তে পড়িবে এবং দক্ষিণার্দ্ধ আবার সূর্য্যের সন্নিকটে আসিবে।

এই জন্য অ্যাডহিমার বলেন, উত্তরার্দ্ধ সূর্য্য হইতে শীতে যখন দূরে পড়িয়াছিল তখন ইয়োরোপ এই ভীষণ শীত হয়।

ইয়োরোপের এই প্রচণ্ড শীতে জীব জগতে বিনাশ আরম্ভ হইল, সমস্ত নদ নদী, হ্রদ সমুদ্র, হিমশৈলাকারে জমাট বাঁধিয়া গেল। মূর্ত্তিমান মৃত্যু সমস্ত ইয়োরোপকে অধিকার করিল। শত শত হস্তী গণ্ডার ইত্যাদি জীব একেবারে যে লোপ পাইল আর ইয়োরোপে সে জাত জন্মাইল না। কত দিন ধরিয়া এই দারুণ শীত ইয়োরোপের অধিকাংশ স্থান হিমশৈলাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব।

মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা।

ঠিক কোন সময়ে যে মনুষ্য জন্মিয়াছে তাহা নির্ণয় করা বড় দুঃসাধ্য। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক যত্ন করিয়াও এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে মনুষ্য যে হিমশৈলকালের পরবর্ত্তী এই মতটিই সাধারণতঃ পরিগৃহীত। কিন্তু কোন কোন গুহায় মৃত জন্তু-দেহ রাশির

---

* দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৃথিবীর গতি প্রণালীতে ক্রান্তিপাতের গতি দেখ।

সহিত মনুষ্য-নির্ম্মিত পুরাতন অস্ত্রাদি পাইয়া এবং অন্যান্য কারণে মনুষ্য হিমশৈলকালের পূর্ব্ববর্ত্তী ও চতুর্থ যুগের মাঁমথ প্রভৃতি প্রকাণ্ড জন্তুগণের সমকালিক ইহাও অনেকে বলেন।

কার্কডেল গহ্বরে মনুষ্যের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কেণ্ট-গহ্বরে, বিলুপ্ত এবং আধুনিক জন্তুকঙ্কালের সহিত চর্ব্বিত অস্থিচূর্ণ, মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত অস্ত্র ও দগ্ধ অঙ্গার পাওয়া গিয়াছে। Rev. J. MacEnery বলেন গুহার যে Stalagmite * মৃত্তিকাস্তরের নিম্নে এই সকল অস্ত্রাদি পাওয়া যায় তাহার উপরে আবার আর একটি স্তর। হিমশৈলের পূর্ব্বে মনুষ্য না জন্মিলে অতি পুরাতন Stalagmite মৃত্তিকা নিম্নে কি প্রকারে মনুষ্যচিহ্ন আসিবে? কিন্তু ডাক্তার বক্ল্যাণ্ড বিশ্বাস করেন না যে Stalagmite মৃত্তিকা নিম্নে এই সকল অস্ত্রাদি ছিল। তাঁহার মতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রাচীন ব্রিটনেরা ঐ গুহায় চুল্লী নির্ম্মাণার্থে অস্ত্রাদি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে যে সকল অস্ত্রাদি নিম্ন স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল অস্ত্রাদির উপর কালে আবার স্তর পড়িয়াছে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ফকনর ব্রিক্সহামের নূতন

---

* উপর হইতে জল চুয়াইয়া পড়িয়া গুহা অভ্যন্তরে যে চূর্ণমাটী উৎপন্ন হয় তাহার নাম ষ্ট্যালাগ্‌মাইট।

আবিষ্কৃত গুহা নিজে পরীক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন করিতে সেথানে গমন করিলেন। যদিও এই গুহায় একটিও মনুষ্যাস্থি ছিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পশু-কঙ্কালের সহিত অস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত ছিল। একখানি ছুরিকার অতি সন্নিকটে পুহাশায়ী ভল্লুকের একটি পদ এরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে এই দুই বস্তুর সমকালিকতায় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা কোন সময়ে এই গুহাস্থিত হইয়াছে কে নির্ণয় করিবে? তাহা করিতে পারিলেই আদিম মনুষ্যের উৎপত্তির কাল স্থির করা যাইত।

ইহা ব্যতীত সম্‌নদী তীরে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভ-উৎপন্ন স্তরে এবং উদ্ভিদ-দেহাবশেষ মৃত্তিকায়, মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত প্রস্তর-অস্ত্র এবং আমিয়া নগর সন্নিহিত সাঁতাস্যালের কঙ্কর-গহ্বরে মনুষ্য-গণ্ডাস্থি ও মনুষ্য-দন্ত পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্যচিহ্ন-বিশিষ্ট স্তরের মধ্যে সাঁতাস্যালের স্তর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এই স্তর যে কত দিন পূর্ব্বের তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে—সম নদীর উপকূল-স্থিত মৃত্তিকাবশেষ-উদ্ভিদ-স্তরের ন্যায় স্থূল স্তর হইতে ৭০০০ হাজার বৎসর লাগিবার কথা, সাঁতাস্যল-স্তর তাহা হইতেও প্রাচীন, সুতরাং ৭০০০ বৎসর হইতেও ইহার বয়ঃক্রম অধিক।

দুই এক শতাব্দী হইতে পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রায় মধ্যে মধ্যে মনুষ্য-নির্ম্মিত পুরাতন প্রস্তর-অস্ত্রাদি পাওয়া

যাইতেছে। কিন্তু স্ক্যানডেনেভিয়ার মত অন্য কোন স্থানে রীতিমত তাহাদের অনুসন্ধান হয় নাই।

"স্ক্যানডেনেভিয়ার তীরে স্তূপাকার শম্বুক খোলার যে সকল পর্ব্বত দেখা যায় তাহা মনুষ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণের আর একটি উপকরণ।

পূর্ব্বে মনুষ্যেরা আহারান্তে যে সকল শম্বুক জাতীয় জীবের খোলা ফেলিয়া দিয়াছে তাহাই স্তূপাকার হইয়া পর্ব্বতাকার হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিত্যক্ত শম্বুক খোলা-রাশির পর্ব্বতাকার ধারণ করিতে বহুকাল সাপেক্ষ। এই পর্ব্বতে যদিও ধাতব কোন অস্ত্র দেখা যায় নাই কিন্তু পশু-কঙ্কালের সহিত মৃত্তিকাপাত্র ও চকমকি-প্রস্তর-নির্ম্মিত ছুরিকাদি পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার মাসাচ্যুসেট এবং জর্জিয়া সীমা পর্য্যন্ত এইরূপ পশু-কঙ্কাল ও অস্ত্রাদি-সঙ্কুল শম্বুক-স্তর পাওয়া গিয়াছে। স্ক্যানডিনেভিয়ার প্রাণী-বেত্তাগণ এই সকল অস্ত্রাদির নির্ম্মাণের কাল নির্ণয় করিয়া ইহা হইতে মনুষ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকারে প্রস্তর, পিত্তল, লৌহ অস্ত্রাদির ব্যবহার কাল শ্রেণীবদ্ধ করেন—

প্রথম প্রস্তর ব্যবহার কাল।

দ্বিতীয় পিত্তল ব্যবহার কাল।

তৃতীয় লৌহ ব্যবহার কাল।

প্রস্তর অস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তরে পাওয়া যায় সুতরাং

প্রথমে মনুষ্য প্রস্তর অস্ত্রই নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ প্রস্তর অপেক্ষা ধাতুকে আকরিক অবস্থা হইতে ব্যবহারোপযোগী করিতে শিক্ষা করা কাল-সাপেক্ষ। তার পর রসায়ণবিদ্যাবিতেরা জানেন যে লৌহকে ব্যবহার উপযোগী করিতে আরো অধিক শিক্ষার আবশ্যক। সহজে আকরিক লৌহকে ব্যবহারোপযোগী করা যায় না। সুতরাং প্রস্তর-অস্ত্রাদি ৫০০০ হইতে ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এবং পিতল নির্ম্মাণ কাল ৩০০০ হইতে ৪০০০ পর্য্যন্ত। লৌহ আরো আধুনিক।

মনুষ্য যে মামথ হস্তীদিগের সমকালীন এবিষয়ে আরো একটি যুক্তি আছে। আসিয়া ও ইয়োরোপের নানা স্থানের হ্রদে একরূপ বাসস্থান-চিহ্ন পাওয়া যায়। বাঁশ, কাষ্ঠ প্রভৃতি জলের মধ্যে পুতিয়া সেই ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তখন মনুষ্য বাস করিত। তীরে যাইবার আবশ্যক হইলে সেতু ফেলিয়া গমন করিত এবং ইচ্ছামত সে সেতু উঠাইয়া লইত। আরণ্য জন্তুর ভয়েই এইরূপ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার সম্ভাবনা। সুইজরলণ্ডের হ্রদের এইরূপ বাসস্থানে অসংখ্য অস্ত্র ও মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। জুরিজ ও কনষ্ট্যানস হ্রদে কোদাল ও কেল্ট জাতির ব্যবহৃত পাত্রাদি এবং এক-বৃক্ষের গুড়ি-নির্ম্মিত নৌকা পাওয়া গিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের স্তরে এইরূপ মনুষ্য চিহ্নের কারণ

হয় ত চিরকালই রহস্য থাকিবে। নিশ্চয় যে কবে মনুষ্য জন্মিয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই, হইবে কি না তাহাও বলা যায় না, তবে মনুষ্যের বয়ঃক্রম ৭০০০ বৎসরের ন্যূন নহে ইহাই একরূপ সম্ভব পর—কিন্তু বিশেষ প্রমাণ অভাবে এ সম্বন্ধে এখনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই।

মনুষ্য জাতির বয়স ছাড়া মনুষ্য সম্বন্ধে আরো অনেক গুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমতঃ মনুষ্য কি প্রকারে উৎপন্ন? পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির যে একটি ক্রম-উন্নতির নিয়ম দেখিতে পাই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমশ মনুষ্য অভিব্যক্ত কিম্বা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে একেবারে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে? এই কথা লইয়া বিজ্ঞান জগতে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবের সীমাবহির্ভূত। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্য কি? পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ কোথায়? এ বিষয়ে আমরা এই বলিতে পারি, মানুষ বুদ্ধিমান; ন্যায়অন্যায় বিবেচনা-ক্ষমতাই পশু হইতে মানুষকে ভিন্ন করিয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র বুদ্ধিমান বলিলেই মানুষের ঠিক সংজ্ঞা হইল না। বুদ্ধিতে অনেক সময় পশুদিগকে মনুষ্যের কাছাকাছি হইতে দেখা যায়, কিন্তু মনুষ্যের আর এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যাহা পশুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। চিন্তাশীলতাই

মনুষ্যের সেই বিশেষ গুণ। সুতরাং মানুষ কি, ইহার উত্তরে সংক্ষেপতঃ এই বলা যাইতে পারে—মানুষ বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল। এই দুই শক্তির বলেই মনুষ্য বাহ্য জগতের অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দ্বারাই মনুষ্য সমস্ত পৃথিবীকে দমনে রাখিয়া আবার মনকে মহৎ চিন্তার দ্বারা অত্যুচ্চে উঠাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার দ্বারাই মনুষ্য কবি, ইহার দ্বারাই মনুষ্য ভাবুক—ইহার দ্বারাই মনুষ্য অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ এবং অসীম ভাব ধারণা করিতে সক্ষম। এই চিন্তাশীলতা হইতেই নিউটনের "প্রিনসিপিয়া," লাপ্লাসের "মেকানিক সেলেস্ত" কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপিয়ারের ওথেলো লিয়ার ইত্যাদি রচিত।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে জঙ্গলবাসী বৃক্ষারোহী একজন অসভ্য মনুষ্য পিনেল নামক চিকিৎসকের নিকট আনীত হয়। এই মনুষ্য গাছে চড়িয়া থাকিত, এবং শুষ্ক পর্ণের উপর শয়ন করিত, আর মনুষ্য দেখিলেই পলাইয়া যাইত। এক শীকারী ইহাকে দেখিয়া ধৃত করিয়া আনে। এ, কথা কহিতে পারিত না, কিম্বা বুদ্ধির কোন লক্ষণ ইহাতে ছিল না। অ্যাভেরন নামক স্থান হইতে ইহা আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অ্যাভেরনস্থ অসভ্য প্রদত্ত হইল। এই আশ্চর্য্য জীব, মানুষ কি না এই কথা লইয়া প্যারিসের পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর ইটার্ড্ এই অ্যাভিরনের অসভ্য মনুষ্য

সম্বন্ধে এক প্রীতিপ্রদ গল্প লিখিয়াছেন। "এই মনুষ্য কখন কখন বাগানে নামিয়া যখন ফোয়ারার এক প্রান্তে বসিয়া জলের দিকে অতি স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিত তখন তাহার মুখে একটি অতি গম্ভীর দুঃখের ছায়া পড়িত। অনেক ক্ষণ ধরিয়া সে নিস্তব্ধে এইরূপে বসিয়া জল দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর ধীরে ধীরে ঘাস ও শুষ্ক পত্র ভাসাইয়া দিত, রাত্রিতে যখন পরিষ্কার জ্যোৎস্না তাহার গৃহে প্রবেশ করিত, সে উঠিয়া জানালায় আসিয়া অনেক-ক্ষণ নিস্তব্ধ-অচল ভাবে ঘাড় নোয়াইয়া এক দৃষ্টে সেই জ্যোস্না-দীপ্ত দৃশ্যের উপর চাহিয়া আনন্দজনক চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িত।" এই অসভ্য যে মানুষ তাহার কোন সন্দেহ নাই। এরূপ বুদ্ধি ও স্বপ্নময় ভাব—এরূপ ভাবুকতা এক কথায় এরূপ চিন্তাশীলতা বানরের কখনই সম্ভবে না।

অসভ্য বানরবৎ মনুষ্যের আধুনিক সভ্যতায় আসিতে কত বৎসর লাগিয়াছে তাহা গণনা করিয়া স্থির করা অসম্ভব।

সেই আদিম উলঙ্গ অসহায় দুর্ব্বল মনুষ্যের যে ভয়ঙ্কর হিংস্র-পশু ও প্রকৃতির ক্রোধের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐরূপ দিন ক্রমে শেষ হইল, সামাজিক-গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যগণ পরস্পর স্বার্থলাভে উত্তেজিত ও দলবদ্ধ হইয়া শীঘ্রই প্রকৃতি ও পশুকে দমন করিতে কৃতকার্য্য হইল।

একদিকে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাৎ অপরদিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর দ্বারা স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়িত, ভয়ে কম্পমান, বিপদভারে আক্রান্ত অশিক্ষিত অসহায় মনুষ্যগণ প্রয়োজনবাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থে প্রথমে দলবদ্ধ, পরে পরস্পর সাহায্য লইয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ, ও বাসস্থান প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিল। সর্‌জন লবকের আদিম মনুষ্য নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারা যায়।

মনুষ্য সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন এই, মনুষ্যজাতি এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন কি না? এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অনেক প্রাণীবেত্তাদিগের মত, যে মনুষ্য এক পিতা মাতা হইতে প্রথমে উৎপন্ন, পরে স্থানাভাব হেতু, সেই মনুষ্যের বংশাবলী যখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল তখন জল বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ সেই এক বংশাবলী হইতেই ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির উৎপত্তি। কিন্তু আদিম আমেরিকাবাসী, চীন, কাফ্রী, ইয়োরোপ ও আসিয়াবাসী সকলেই বাস্তবিক এক বংশোদ্ভূত কিনা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ভাষার সমালোচনা দ্বারা ইহা নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে যে ইয়োরোপ ও আসিয়ার অনেক জাতি এক পিতা মাতা সম্ভূত। এই একমূল উৎপন্ন জাতিরাই আর্য্য নামে আখ্যাত। আসিয়ার শ্যাম শোভাশালী উর্ব্বর ভূমি ককেসস পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ মনুষ্য জাতির, অন্ততঃ

আর্য্য জাতির জন্মস্থান ইহাই সম্ভবপর মনে হয়। সমস্ত দেশের আর্য্যজাতিদের সাধারণ প্রচলিত প্রবাদই ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

আসিয়া-বন্যা।

বহুদূর বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী উত্থানই আসিয়ার বন্যার কারণ। এই পর্ব্বতশ্রেণী ককেসস পর্ব্বতশ্রেণীর অংশ। পৃথিবীর অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময় ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত পদার্থ নিঃসৃত হইতে লাগিল। অন্যান্য আকরিক পদার্থের সহিত নির্গত জলীয় বাষ্প, স্তম্ভাকারে উঠিয়া প্রথমে আকাশে মেঘ রূপে জমিতে লাগিল, পরে সেই বৃষ্টিবারি এবং ভূগর্ভনিঃসৃত কর্দ্দম দ্বারা আসিয়া প্লাবিত হইল। এই উত্তপ্ত-পদার্থ-উৎপাতের আমরা দুই প্রকার ফল দেখিতে পাই, একটি ক্ষণস্থায়ী, একটি চিরস্থায়ী। উপরোক্ত অগ্ন্যুৎপাত হেতু বহুদূরবিস্তৃত তখন যে বন্যা হইয়াছিল, তাহাই ক্ষণস্থায়ী, এবং বহুদূরব্যাপী ,১৭৩২৩,ফিট উচ্চ যে আরারট পর্ব্বত এখন আমরা দেখিতে পাই ইহাই চিরস্থায়ী সেই অগ্ন্যুৎপাত চিহ্ন। প্রায় সকল জাতির মধ্যেই এই বন্যার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন আর্য্যজাতির সকল গ্রন্থেই তো এই কথার উল্লেখ আছে, এমন কি সংস্কৃত মহাভারত পাঠে জানা যায় মনু যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা বেদব্যাসের সময়

নৌ বন্ধন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইয়োরোপীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাই-বলের প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিশেষ যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১১। নোয়ার ৬০০ বৎসর বয়সে বৎসরের দ্বিতীয় মাসের ১৭ দিবসে মহাসমুদ্রের উৎস ভঙ্গ হইল এবং স্বর্গের দ্বার সকল উন্মুক্ত হইল—

১২। "এবং ৪০ দিবস দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল।

... ...

১৭। "এবং ৪০ দিন পৃথিবীতে বন্যা বহমান হইল। এবং জলবৃদ্ধি সহকারে নোয়ার আর্ক নামক নৌকাকে ভাসাইয়া পৃথিবীর উপর উঠাইল।

... ...

১৯। "এবং জল অত্যন্ত বাড়িয়া আকাশের নিম্নস্থ সমস্ত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত জলমগ্ন করিল।

২০। "১৫ হস্তেরও অধিক জল উঠিল এবং পর্ব্বত সকল মগ্ন হইল।

২১। "এবং কুক্কুটাদি পালিত জন্তু, আরণ্য-পশু এবং সর্পাদি সরীসৃপ ও মনুষ্য, এই সকল পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীর মৃত্যু হইল।

২৩। "এবং প্রত্যেক স্থলচর জীবগণই বিনষ্ট হইল, পশু মানুষ, সরীসৃপ এবং শূন্যগামী পক্ষী সকলই মৃত হইল,

কেবল মাত্র নোয়া এবং তাহার সহিত আর যাহারা নৌকায় ছিল তাহারাই বাঁচিল"।

২৪। এবং ১৫০ দিন পর্য্যন্ত জল পৃথিবীর উপর রহিল।"

যে সময় মুষা এই সকল কথা লিখিতেছেন তার ১৫০০ কি ১৪০০ বৎসর আগে বন্যা হইয়াছিল বলিয়া বাইবেলে লিখিত আছে।

আলেকজ্যাণ্ডারের সমসাময়িক ক্যালডিয়ান ইতিহাস লেখক বিরোসাসের মতে পৃথিবীব্যাপী এই বন্যা নাইনাস (*N*inus) রাজার পিতা বেলাসের (Belus) রাজত্বের ঠিক পূর্ব্বে।

বিখ্যাত চীন জ্ঞানী কংফুৎসে যিনি খৃষ্টর ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন তিনি চীনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—বন্যার জল আকাশসমান উচ্চ হইয়া অত্যুচ্চ-পর্ব্বত-চরণ ধৌত করিয়া অল্প উচ্চ পাহাড় ও সমস্ত স্থল, মগ্ন করিল। পরে চীন সম্রাট জাসের আজ্ঞায় সেই জল সরিয়া পড়িল।

এইরূপ আসিয়ার প্রত্যেক জাতিতেই এই বন্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরারট পর্ব্বত নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া উত্তপ্ত পদার্থ নির্গত হওয়াতে, প্রথমে আধুনিক আরারট পর্ব্বত সন্নিহিত প্রদেশেই বন্যা আরম্ভ হইয়া, সেখান হইতে ক্রমে দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত জল ব্যাপ্ত হইল।

আধুনিক কালের একটি বন্যার বিবরণ হইতে সেই পুরাতন ভয়ানক বন্যার প্রভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে মেক্সিকো হইতে ছয় দিনের পথে একটি উর্ব্বর প্রদেশ ছিল, সেখানে ধান্যাদি শষ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ঘন ঘন ভূকম্পন দ্বারা ঐ প্রদেশ ক্রমাগত তুইমাস ধরিয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল। ২৮ শে সেপ্টেম্বরে ঝটিকাক্রান্ত সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গিত কঠিন পৃথিবীর উপর সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকাশৈল উঠিতে পড়িতে লাগিল. পরিশেষে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত প্রস্তর ও ধাতুপিণ্ড অত্যুচ্চে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা পর্ব্বতে পরিণত হইল। এই গহ্বর-মুখ-নিঃসৃত অনেকগুলি পর্ব্বতের মধ্যে জরুলো নামে একটি পর্ব্বত প্রাচীন সমভূমি হইতে প্রায় তিনি সহস্র ফুট উচ্চ হইয়াছে। এই বিপ্লবের পর যে স্থানে জরুল পর্ব্বত উৎপন্ন হইল পূর্ব্বে সেই স্থানে কুটিম্বা ও সানপিদ্রো নামে তুইটি নদী ছিল। বিপ্লবের সময় এই তুই নদী উজান বহিয়া সমস্ত প্রদেশ জলমগ্ন করিয়াছিল এবং বিপ্লবের পর হইতে ঐ নদীদ্বয় অনেক পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে। এই বন্যায় প্রাচীন বন্যার কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

চতুর্থ যুগের নদী এবং সমুদ্রে মৃত্তিকা থিতাইয়া অনেক স্থানে স্তর-সংস্থিতি হইয়াছে।

ইয়োরোপ সিসিলি দ্বীপে আমেরিকার বিখ্যাত প্যাম্পা

সমভূমিতে আফ্রিকার মিশরে ও ভারতবর্ষের বাঙ্গালা প্রদেশে চতুর্থ যুগের স্তর-সংস্থিতি বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়।

তৃতীয় যুগের শেষ ভাগ ও চতুর্থ যুগ উৎপন্ন স্তর অনেকটা একরূপ তবে প্রভেদ এই যে চতুর্থ যুগের স্তর-সকল সমুদ্র কিম্বা নদীর উপকূলেই দৃষ্ট হয় এবং ইহারা বর্ত্তমান সময়ের ভিন্ন ভিন্ন শম্বুক জাতিতে পরিপূর্ণ।

এই প্রস্তাবটি শেষ করিবার আগে—সূর্য্য হইতে পৃথিবীর বাষ্পচক্র খসিয়া অবধি এখন পর্য্যন্ত আমরা কি দেখিলাম, একবার ভাবিয়া লওয়া উচিত।

বাষ্পময় গোলক হইতে তরল হইয়া কি করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠ ঘন হইল কি করিয়া সমুদ্র দেশ মহাদেশ পর্ব্বত ইত্যাদি সৃষ্ট হইল, কত বিপ্লব পৃথিবীর মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, কি করিয়া প্রথম প্রাণী সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ক্রমে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া আসিল আমরা সকলি দেখিয়া অবশেষে প্রাণী জন্মের উন্নতির চরম সীমায় মনুষ্য জাতির জন্ম দেখিলাম।

এখন পৃথিবীর জলস্থল একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, [illegible] উচ্ছ্বাস, পর্ব্বত উত্থান জনিত বিষম বিপ্লব এখন আর সাধারণত সকল স্থানে সর্ব্বদা হয় না, তাহা এখন কদাচিৎ এবং স্থানিক হইয়া পড়িয়াছে। শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্নদেশে এখন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতেছে।

জল-জন্তু স্থল-জন্তু শূন্যের জন্তু এখন অসংখ্য এবং এই সকল দেখিয়া ভাবিবার জন্য মনুষ্যও সৃষ্ট হইয়াছে।

জীব জগতের উন্নতি সহকারে কি করিয়া ক্রমে মানুষ সৃষ্ট হইল ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই সাইলিউরিয়ান-অন্তর যুগের মৎস্য-পাখনা কালে উন্নতি লাভ করিয়া কিরূপে দ্বিতীয় যুগের সরীসৃপদিগের পৃষ্ঠে বসিল এবং পরে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া কিরূপে পক্ষীর পক্ষ সৃষ্ট হইল আবার সরীসৃপদিগের অস্পষ্ট খর্ব্ব পদ চতুষ্পদ জন্তুদিগের অঙ্গে স্পষ্টকৃত হইয়া বানরে পূর্ণতা লাভ করিবার পর আরো উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য-অঙ্গে তাহা কেমন শোভিত হইল, এক কথায় কি করিয়া অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া পৃথিবী বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইল এই সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উন্নতির নিয়ম দেখিয়া আমরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি, এবং এই প্রশ্নটি স্বভাবত মনে উচ্ছ্বসিত হয় যে, যে ক্রমোন্নতির দ্বারা পৃথিবীর আকৃতির আমরা পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, সে উন্নতি কি চিরকাল চলিবে? কিম্বা এই খানেই তাহার শেষ? যে সকল শক্তির কার্য্যহেতু হিমালয় আল্প প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শক্তি কি চিরকাল কার্য্য করিয়া ভবিষ্যতে শত শত পুরাতন পর্ব্বত ধ্বংস পূর্ব্বক নূতন পর্ব্বত সৃষ্ট করিতে থাকিবে, কিম্বা আমরা

এখন পৃথিবীকে যেরূপ অবস্থায় দেখিতেছি পৃথিবী চির-কালই এইরূপ থাকিবে ?

ভূতকাল অনেকটা বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহা নহে, তবে অবরোহ প্রণালী অনুসারে ভূত কাল দেখিয়া ভবিষ্যৎ কালের সম্বন্ধে বিজ্ঞান ইহাই কল্পনা করেন যে এই উন্নতি-পরম্পরা আবহমান চলাই সম্ভবপর। ইহার ধারাবাহিতাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। পৃথিবীর জল-স্থল-বিভাগ এখন যেরূপ আছে কালে যে পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর ভবিষ্য ইতিহাসের আর একটি পৃষ্ঠা পড়িতে সকলেরই কৌতূহল হয়। আদিম কালের আকরিক পদা র্থের প্রাধান্য লোপ করিয়া যেরূপ উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে উদ্ভিদের পরিবর্ত্তে জীবজন্তু এবং জীবজন্তুর পরিবর্ত্তে মনুষ্যের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ মনুষ্যজাতির প্রাধান্য গিয়া অপর উন্নত জাতির আবির্ভাব হইবে কি না? বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। মঙ্গল ও ক্রমোন্নতি ঈশ্বরের সৃষ্টির নিয়ম। এই উন্নতির চরম সীমায় মনুষ্য অবস্থিত কি না তাহা অনন্ত ব্যাপ্যমান জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরেই লুক্কায়িত, ইহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত।

ভূ-গর্ভ।

অষ্টম অধ্যায়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর কি প্রকার? আমরা পৃথিবীর উপরিভাগ যেরূপ দেখিতেছি, পৃথিবীর অন্তর-প্রদেশও কি সেইরূপ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৪ হাজার মাইল বা ২১১২০০০০০ দুই কোটী একাদশ লক্ষ বিষ হাজার ফুট তাহার মধ্যে কেবল ৫০০০ হাজার ফুট মানুষের চক্ষুগোচর হইয়াছে মাত্র। ইহা অপেক্ষা অধিক দূর নিম্নে খনন করিয়া দেখিবার কোন উপায় এখনো বাহির হয় নাই, সুতরাং কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী-গর্ভ যে কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কেহ এখনো নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহারই উপর যুক্তি খাটাইয়া, এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান দ্বারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা ভূগর্ত্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান—

১। পৃথিবীর আবরণ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রবপদার্থময়।

২। পৃথিবী, কেন্দ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হউক প্রায় কঠিন।

৩। পৃথিবীর আবরণ যেরূপ কঠিন তাহার কেন্দ্রও তদ্রূপ, কেবল ভূপৃষ্ঠ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থল দ্রবপদার্থময়।

৪। ভূ-পৃষ্ঠ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়।

পৃথিবীর নিম্নদেশ যতদূর মনুষ্যের পরীক্ষার অন্তর্ভূত হইয়াছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভূবেত্তাগণ প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থান খনন দ্বারা যে পাঁচ হাজার ফুট মানুষের পরীক্ষাধীন হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নিম্নতা অনুসারে ক্রমশই উত্তাপ বাড়িতে থাকে। এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ যদিও পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক সমান নহে, নানা স্থানীয় কারণে (Local cause) ইহার অল্প স্বল্প বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু বহু সংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে পৃথিবীর অন্তরে প্রবেশ করিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক ১০০ ফুটে তাপমান যন্ত্রের নূন্যাধিক ১॥ ডিগ্রি উত্তাপ বাড়ে। উত্তাপবৃদ্ধির এই নিয়মানুসারে ভূগর্ভে এত উত্তাপ জমিবার কথা যে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রব-পদার্থময় হইবারই সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া এ মতের পক্ষে আরো অনেক বলবান কারণ আছে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক বহুদূরব্যাপী স্তরসংস্থিতি (Alternate deposit of sedimentary rocks) দেখিতে পাওয়া যায় যে ভূগর্ভকে তরল মনে করিয়া না লইলে সে সংস্থিতির কোন কারণ নির্দ্ধারিত করা যায় না। ইহা ছাড়া পৃথিবীর কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর অংশ নীচু হইয়া পড়ে। ভূগর্ভ তরল না হইলে এরূপ হইত না। কারণ তরল পদার্থের সাধারণ একটি গুণ এই যে তাহার

কোন এক স্থানে অধিক চাড় পড়িলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উচ্চ হইয়া উঠে।

এই সকল এবং অপরাপর কারণে ভূবেত্তাগণ ভূগর্ভকে দ্রব পদার্থময় বলেন।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হপকিন্স সর্ব্বতোভাবে এক সমান দুইটি দোলক যন্ত্র (Pendulum) লইয়া একটার নিম্নস্থ ধাতব গোলকের বদলে একটি সমান ভারের পারদপূর্ণ কাঁচের গোলক বসাইয়া দেন। এই দুইটির গতিবিধি আলোচনা করিয়া তিনি দেখেন ধাতব দোলক অপেক্ষা পারদপূর্ণ দোলকটি শীঘ্রগামী হয়। পৃথিবীর স্বকক্ষভ্রমণের উপর এই দৃষ্টান্ত খাটাইয়া, নানা প্রকার জ্যোতিষিক গণনা ও যুক্তি দ্বারা তিনিই প্রথমে সাব্যস্ত করেন যে ভূগর্ভ, কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সংঘাত-কঠিন। তিনি বলিলেন তাহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ দ্রব-পদার্থ-পূর্ণ হইলে, পৃথিবী এখনকার অপেক্ষা শীঘ্রগামী হইত; তাহা হইলে ক্রান্তিপাতের বক্রগতি ও মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন গতি (Precession and Nutation) এখন যেরূপ আছে নিশ্চয়ই সেরূপ থাকিত না। পরে সার উইলিয়ম টম্‌সন্ ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব আরচ্‌ডিকন প্র্যাট্ অন্য নানারূপ যুক্তি দ্বারা হপকিন্সের এই মতটির পক্ষ সমর্থন করেন। যত দিন ফরাসি পণ্ডিত ডিলনে এই মতের

ভ্রম প্রমাণ না করেন ততদিন পর্য্যন্ত ভূবেত্তাগণ আপনাদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিপক্ষেও হপ্‌কিন্স প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা ঘাড় পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভূবেত্তাদিগের মধ্যে এক জনও এমন অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন না যিনি হপ্‌কিন্স প্রভৃতি অসাধারণ গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গণনার ভুল ধরিতে পারেন। ফরাসী পণ্ডিত ডিলনে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে হপকিন্সদিগের একজন সমকক্ষ ব্যক্তি। তিনি উপরি-উক্ত মতটির সমালোচনা করিয়া তাহার অসারতা দেখাইয়া বলিলেন, পৃথিবী দ্রবপদার্থে পূর্ণ হইলে তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া হপ্‌কিন্সের দোলক যন্ত্রেব পরীক্ষা পৃথিবীর সম্পর্কে কেমন করিয়া খাটিবে? প্রথমতঃ দোলকের গোলক লম্বমান দণ্ড অবলম্বন করিয়া দোলে ও পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে, সুতরাং দোলক যন্ত্রের গতির দৃষ্টান্তে পৃথিবীর গতি নিরূপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কাচে পারদ যেরূপ অসংলিপ্ত থাকে ভূগর্ভস্থ পদার্থ তাহার উপরিস্থ আবরণের সহিত সেরূপ বিচ্ছিন্ন থাকিলে হপ্‌কিন্‌সের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর আবরণের সহিত ভূগর্ভের পদার্থ এমনি সংলিপ্ত যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সত্বেও উভয়ে কঠিন-পদার্থ-নির্ম্মিত একটি বস্তুর ন্যায়ই কার্য্য করে।

পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন মানিয়া লইলে আর

একটি গোল বাধে। তাহা হইলে জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাতের কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যাঁহাদের মতে ভূগর্ভ কঠিন তাঁহারা বলেন, জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাত স্থানীয় কারণ-প্রসূত। বিশেষ কোন কোন পর্ব্বতগর্ভে যে সকল পদার্থ নিহিত থাকে, কালে তাহাই উদ্গীরিত হয়, সে সকল পদার্থ সাধারণ ভূগর্ভের নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক আপত্তি আছে। বহুসংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, পৃথিবীর সকল স্থানের জ্বালামুখী হইতে একই প্রকার পদার্থ উদ্গীরিত হয়। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত জ্বালামুখী হইতে স্থানীয় কারণ বশতঃ একই প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সাইমেন্‌স্ গত বৎসর বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া ভূগর্ভের তরলতার পক্ষে অতি সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়াছেন।

তিনি বিসুবিয়াস পর্ব্বতে গিয়া দেখেন, পর্ব্বতের গহ্বর মধ্য হইতে দুই তিন সেকেণ্ড অন্তর সশব্দে বাষ্প নির্গত হইতেছিল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পর্ব্বতের খুব গভীর প্রদেশে বাষ্প প্রস্তুত হইয়া যদি হঠাৎ ঊর্দ্ধে উঠে তাহা হইলেই ঐরূপ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক বারের বাষ্পোদ্গীরণের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত ধাতু দ্রব (Lava) উত্থিত হইবার কথা, এবং পর্ব্বতের ধূমনলের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণ ধাতব

পদার্থ জমিবার জন্য সময় আবশ্যক। কাজেই তাহা হইলে দুই তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সশব্দে কেবল মাত্র বাষ্প উদ্গীর্ণ হইত না। অন্য সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া সাই-মেনস্ এইরূপ বাষ্পোদ্গীরণের এই কারণ দেন যে, নিম্নোত্থিত বিশুদ্ধ কিম্বা বিমিশ্র জলজান বাষ্প উপরের বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া সশব্দে জলিতে থাকে। এবং নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি বলেন, যদি ভূগর্ভ দ্রব-পদার্থময় না হইত তাহা হইলে ভূগর্ভে এত প্রচুর পরিমাণে জলজান বাষ্প জন্মাইত না।

অপর কতকগুলি বৈজ্ঞানিকেরা অন্য প্রকার যুক্তি দেখাইয়া ভূগর্ভের কাঠিন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক জেম্‌স টমসন্ গণনা করিয়া বলেন যে চাপের আধিক্য হইলে কোন বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপের আবশ্যক করিবে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বুন্‌সেন মোম ও গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের উপর পরীক্ষা করিয়া এই মতের পোষকতা করেন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হপকিন্স নিজে ঐ সকল দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া ভূগর্ভ যে কঠিন—এই মতটি অভ্রান্ত বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। এই পরীক্ষা অবলম্বন করিয়া বুন্সেন বলেন পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন না হইয়া থাকিতে পারে না। মোমকে উপর্য্যুপরি থাক্-থাক্ করিয়া রাখিলে, তাহার সর্ব্ব প্রথম

থাক্ গলাইতে যে উত্তাপ লাগে, দ্বিতীয় থাক্ গলাইতে তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ লাগিবে, তৃতীয় থাক্ গলাইতে আরো অধিক, এই রূপ যতই নিম্নের থাকে আসা যায় ততই তাহাকে গলাইতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে এত অধিক চাপ যে তথাকার কোন পদার্থকে যে-সে উত্তাপ গলাইতে পারে না। যে পরিমাণ উত্তাপে কেন্দ্রস্থ পদার্থ গলিতে পারে তত প্রচণ্ড উত্তাপ ভূগর্ভে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ভূগর্ভ সংঘাত-কঠিন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি আছে। মোম, গন্ধক প্রভৃতি যে সকল পদার্থের উপর পরীক্ষা দ্বারা উপরিউক্ত মতটি স্থাপিত, বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবী সে সকল পদার্থে নির্ম্মিত নহে।

এখন দেখা উচিৎ পৃথিবী যেরূপ পদার্থে নির্ম্মিত সেই রূপ ধাতব ও আকরিক পদার্থে পরীক্ষা করিলে কি ফল দাঁড়ায়? সার উইলিয়াম টমসন্ ও হপ্‌কিন্স্ পরে আবার ধাতব দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জেমস্ টম্‌সনের মতটি সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে খাটে না। যে সকল পদার্থ তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয় চাপবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে অল্প উত্তাপের আবশ্যক করে, এবং যে সকল বস্তু ঐরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয়

চাপাধিক্য সহকারে তাহাদিগকে গলাইতেই অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

গত বৎসরের প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সাইমেনস্ এ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। লাপ্লাস্ কল্পিত জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে যদি সৌর জগৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই বাষ্প-রাশির গ্রহ উপগ্রহ আকার ধারণ করিবার সময় দুই প্রকার হইবার সম্ভাবনা। জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উত্তপ্ত তরল পদার্থে পরিণত হইয়া ক্রমে আরো শীতল হইবার সময়, হয়, তাহার উপরের পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়া ভিতরের অংশ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকিবে (যেমন সীসের গোলা ঢালাই করিবার কারখানায় সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়) নয়, তাহার ভিতরের পদার্থ কঠিন হইয়া ক্রমে উপর পর্য্যন্ত কঠিন হইবে। উত্তপ্ত তরল পদার্থ শীতল হইবার সময় তাহার উপরের স্তর ঘন হইয়া নিম্নে ডুবিয়া পড়ে, এই ঘনীভূত পদার্থ আভ্যন্তরিক তাপে আবার তরল হইয়া যদি উপরে উঠে তাহা হইলেই প্রথমোক্ত অবস্থা হয়। কিন্তু উপরের ঘনীভূত পদার্থ নিম্নে ডুবিয়া গেলে যদি আর তরল না হয় তাহা হইলে সেইখানেই তাহা উত্তরোত্তর গাঢ় হইতে থাকে। পৃথিবী যদি প্রথমোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভ তরল, যদি শেষোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তবে ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় কঠিন। এখন

দেখিতে হইবে পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা উক্তরূপে নিমগ্ন হইয়া গেলে আবার তরল হইয়া উপরে উঠিবে কিম্বা নিম্নে পড়িয়া ক্রমশঃ সেখানে গাঢ়তর হইতে থাকিবে ?

যে বস্তু তরল হইতে দৃঢ় অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয় তাহাই লঘু হইয়া একবার নীচে ডুবিয়া গেলেও আবার তরল হইয়া উপরে উঠে এবং যাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয় তাহা আর উপরে উঠে না। সুতরাং দেখা আবশ্যক, পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় বিস্তৃত কিম্বা সঙ্কুচিত হয়। যদি বা সঙ্কুচিত হয়, সে সঙ্কোচনের পরিমাণ কত ? সঙ্কোচনের মাত্রা যত কম হইবে, ততই কোন বস্তুকে গলাইবার জন্য কম উত্তাপের আবশ্যক। বিসকফ্ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন পৃথিবীর পদার্থ তরল হইতে ঘন হইবার সময় শতকরা ২০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। এই পরীক্ষার উপরে গণনা করিয়াই সার উইলিয়ম টম্‌সন বলেন, ভূগর্ভ কঠিন। কিন্তু ম্যালেট্ বড় বড় লৌহের কারখানায় দেখিয়াছেন মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থ শতকরা ৬ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। সাইমেনস্ বলেন তিনি তাহার ভ্রাতার ড্রেস্‌ডেন নগরস্থ কাঁচের কারখানায় দেখিয়াছেন যে দ্রব কাঁচ শীতল হইবার সময় প্রথম খুব সঙ্কুচিত হয় কিন্তু কিছু পরে তাহার সঙ্কোচনের মাত্রা কমিয়া যায়, এমন কি বোধ হয় শেষে দৃঢ় হইবার মুহূর্ত্তে তাহা বিস্তৃত হইয়া

পড়ে। পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কাঁচের সমধর্ম্মী, সুতরাং ভূগর্ভের পদার্থ চাপবৃদ্ধি হেতু যে কঠিন হইবে এমন বলা যায় না।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে আর যে দুইটি মত বলিবার আছে তাহার যুক্তি গুলি অপেক্ষাকৃত সামান্য। একটির, স্থূল মর্ম্ম এই, পৃথিবী প্রকাণ্ড হাঁসের ডিমের মত। ডিম্বস্থ শ্বেত পদার্থ যেমন তাহার উপরিস্থ খোলা এবং অভ্যন্তরের লোহিতাংশের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি পৃথিবীর আবরণ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান দ্রব পদার্থ পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর উর্দ্ধ, নিম্ন দুই ভাগকে বিযুক্ত করিতেছে।

বুন্‌সেন্ মোম গন্ধক প্রভৃতি পদার্থের উপর পরীক্ষা করিয়া বস্তুর দ্রাবণের সম্পর্কে উত্তাপের প্রভাবের বিষয়ে যাহা বলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া উপরি উক্ত মতটি অবস্থিত। এই মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন, পৃথিবীর যত নীচে যাইবে ততই অধিক চাপ, আর চাপাধিক্য সহকারে কোন বস্তুকে গলাইতে যেকালে উত্তরোত্তর অধিক উত্তাপ লাগে, সেকালে নিম্নের পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিতে ক্রমশ অধিক উত্তাপের আবশ্যক। কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা চাপ অধিক; তথাকার পদার্থকে গলাইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপের আবশ্যক, তাহা কি কেন্দ্রে আছে? তাঁহারা বলেন কেন্দ্রে অতিশয় উত্তাপ আছে বটে, কিন্তু তথাপি সেখানকার পদার্থকে দ্রব অবস্থায়

রাখিবার উপযুক্ত প্রচণ্ড উত্তাপ সেখানে নাই, কাজেই তাহা সংঘাত কঠিন। কিন্তু তেমনি কেন্দ্র হইতে যত উপরে আসা যায় তত চাপ কমে, সেই হেতু ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপেই তৎস্থানীয় পদার্থ দ্রব হয়, কাজেই কেন্দ্র ও পৃথিবীর আবরণের মধ্য স্থলে যে পরিমাণে উত্তাপের প্রভাব তাহাতেই সেই স্থানের পদার্থ দ্রব হইবে।

ভূবেত্তারা উপরি উক্ত মতে কোন আপত্তি করেন না; সম্পূর্ণ তরল না বলিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভ তরল বলিলেই তাঁহাদের আর কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু উপরি উক্ত মতের যুক্তি সকল এত সামান্য যে তাহার মূল্য বড় কম। ইহা ব্যতীত পৃথিবী যে প্রকারে উৎপন্ন বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে স্থির হইয়াছে তাহার সহিত এ মতটী সম্পূর্ণ বিরোধী। সংঘাত হইবার কার্য্য যে পৃথিবীর কেন্দ্র স্থান হইতে আরম্ভ হয় না তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ মতানুসারে পৃথিবীর উপরি ভাগ কঠিন, কিন্তু ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়। ইহার পক্ষপোষক যুক্তি গুলি নিতান্ত আনুমানিক, পূর্ব্বের মতের অপেক্ষা এই গুলি আরো অসার। এ মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন পৃথিবীর ঘনত্ব (Mean density) জলের ৫½ গুণ মাত্র। কিন্তু ভূগর্ভে এত বেশী চাপ, যে পৃথিবীর উপরিস্থ কঠিন পদার্থের দ্বারা ভূগর্ভ নির্ম্মিত হইলে চাপের আধিক্য বশতঃ ভূগর্ভস্থ পদার্থ এত ভারী হইত যে গড়ে পৃথিবী জল অপেক্ষা ৫½ গুণের অধিক

ঘন হইত। কিন্তু তাহা যেকালে হয় না তখন ইহা স্থির যে, ভূগর্ভ এমন পদার্থে নির্ম্মিত যাহা পৃথিবীর উপরি-ভাগে আনিলে অত্যন্ত লঘু হইবে। চাপের আধিক্যে বস্তুর যে ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় এই সত্যের উপরেই উপরি-উক্ত অনুমানটি স্থাপিত।

এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর ৮০ মাইল নিম্নে বাতাস জলের মত ভারী হইবে, জল আবার ৩৬০ মাইল নীচে পারদের ন্যায় ভারী হইবে, এবং কর্দ্দম যাহার প্রত্যেক ঘন ফুটের ভার পৃথিবীর উপরি ভাগে ১ মন ২১ সের, ৩৬০ মাইল নীচে তাহার ভার ১৬৮ মন ৩০ সের হইবে, কিন্তু তাহা যে কালে হয় না তখন ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত মাটীর মতন কঠিন দ্রব্যে নির্ম্মিত নহে ; সম্ভবতঃ ভূগর্ত্ত বাষ্পময়। সেই বাষ্প পৃথিবীর উপরে অত্যন্ত লঘু, কিন্তু চাপাধিক্য বশতঃ ভূগর্ভে তাহাতেই বেশ ভার হয়।

কিন্তু এই মতের প্রবর্ত্তকেরা যাহা বলেন প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না, বাষ্পীয় পদার্থের উপর চাপ অর্পণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে চাপ বৃদ্ধি সহকারে ক্রমিকই যে ঘনত্ব বৃদ্ধি হইবে এমন নহে। বরঞ্চ দেখা যায় ক্রমাগত চাপ বাড়াইলে শীঘ্রই এমন এক অবস্থা আসে যখন চাপাধিক্য অনুসারে তাহার আর ঘনত্ব বাড়ে না। যাহা হউক চাপ-বৃদ্ধির দ্বারা যে কি হয় তাহা এখনো সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্বে মনে হইত

সমুদ্রের তলায় যেরূপ অধিক চাপ তাহাতে জীব জন্তু কিম্বা কর্দ্দম থাকিতে পারে না, কিন্তু আটলাণ্টিক সাগরের তলা হইতে প্রাণী ও নরম কাদা উঠান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখিয়া ওরূপ অনুমান যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। মানুষের আয়ত্তাধীন চাপ প্রয়োগেই সমস্ত বাষ্পীয় পদার্থ যখন জলাকারে পরিণত হইয়াছে তখন এত ভয়ানক চাপে ভূগর্ভে বাষ্প থাকা সম্ভাব্য নহে।

এইতো একটি একটি করিয়া চারিটি মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহাদের সকলের সমর্থনকারী যুক্তি সকল দেখিলে মনে হয় ভূগর্ভ যে তরল দ্রবপদার্থ-পূর্ণ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভবপর।

ইহা ছাড়া ইতালীয় বৈজ্ঞানিক পালমিয়েরি বলেন, তিনি ঈটনা নামক জ্বালামুখীর গর্ভে জোয়ার ভাঁটা দেখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হয় নাই। এ বিষয়টি সপ্রমাণ হইলে ভূগর্ভের তরলতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

সম্প্রতি পরলোক গত, ইংলণ্ডের রাজকীয় জ্যোতির্বেত্তা এয়ারি এ বিষয়ে বলেন, যে তাঁহার মতে ভূগর্ভের অধিকাংশ-তরল ও উষ্ণ।

---

* "I do think that a large portion of the central part of the earth is fluid and hot."—On the Probable Condition of the Interior of the Earth by Sir George Airy.

পৃথিবীর পরিণাম।

নবম অধ্যায়।

পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই পরিবর্ত্তন-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জন্ম, জীবন ও মৃত্যু, এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সকল বস্তুই যে সমান সময়ে এই তিন অবস্থা পায় এমন নহে। আমরা যে সময়কে এক মুহূর্ত্ত বলি সেই সময়ের মধ্যেই অনেক কীট পতঙ্গ এই তিন অবস্থা অতিক্রম করে। জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালকে জীবন কহা যায়। পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই এই নিয়মের অধীন, কিন্তু পৃথিবী নিজে এই নিয়মের অধীন কি না? পৃথিবীর জীবনের বিষয় আমরা জানি কিন্তু ইহার মৃত্যু হইবে কি না তাহা আমরা জানি না; আবহমান কাল হইতে পৃথিবীকে আমরা যেরূপ সমভাবে চলিতে দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে আপাততঃ মনে হয় পৃথিবী মৃত্যুর আয়ত্তাধীন নহে।

এখন, দেখা যাক পৃথিবীর ন্যায় একটা গ্রহের জীবন ও মৃত্যু বলিলে কি বুঝায়। পৃথিবীর এখনকার অবস্থাই ইহার জীবনের অবস্থা। এখন পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ জন্মাইতেছে, নদী বহিতেছে, সমুদ্র তরঙ্গিত হইতেছে; এখন দিনের পর রাত আসিয়া, ঋতুর পর ঋতু আসিয়া, পৃথিবীকে

জীব জন্তুর বাসোপযোগী করিয়াছে ; এক কথায়, এখন পৃথিবীতে যাহা হইতেছে তাহাতেই তাহার জীবনের অস্তিত্ব জাজ্বল্যমান। এই অবস্থার অভাব হেতুই চন্দ্রকে আমরা মৃত গ্রহ বলি।

পৃথিবীর বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে হইলেও তাহাতে বাধা পাইয়া আলোকের তির্য্যগ্ গতি (Refraction) হয়। কিন্তু চন্দ্র হইতে আলোক নির্গত হইবার সময় তাহার বক্রগতি হয় না। ইহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে চন্দ্রে বায়ু নাই, আর যদিই বা থাকে, তাহা অত্যন্ত লঘু, সে বায়ুতে পৃথিবীর ন্যায় জীব জন্তু বাঁচিতে পারে না। চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। আমরা যাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলি তাহা প্রকাণ্ড গহ্বর মাত্র, ঐ সকল গহ্বর পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল, এখন শুকাইয়া ঐরূপ গহ্বর হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে জ্যোতির্বেত্তারা বলেন যে চন্দ্রে উদ্ভিজ্জ কিম্বা প্রাণী নাই। চন্দ্র এরূপ মন্দ-গতি যে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেই উহার ২৯½ দিন লাগে। যে গ্রহের চন্দ্রের মত অবস্থা হয় তাহাকেই মৃত কহা যায়।

পৃথিবীর মৃত্যু সম্ভব কি না জানিতে হইলে দেখা আবশ্যক, পৃথিবীতে এমন কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে, কি না যাহাতে তাহার জীবনী-শক্তির হানি করে। দেখা আবশ্যক, পৃথিবীর জীবনী-শক্তির সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল

শক্তি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে কি না যাহার অনিষ্ট-জনক কার্য্য অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর পরমায়ু হ্রাস করিতেছে। যদি আমরা সেইরূপ প্রতিকূল শক্তি দেখিতে পাই তবে তাহার কার্য্য এখন অতীব সূক্ষ্ম হইলেও তাহা হইতে কালে পৃথিবীরও যে চন্দ্রের মত মৃত দশা হইবে না—এরূপ কে বলিতে পারে ?

গ্রহের জীবনের একটি প্রধান কারণ, বৈষম্য। বৈষম্য না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না; যদি সমস্ত পৃথিবী সমতল হইত অর্থাৎ পৃথিবীতে কিছু উঁচু নীচু না থাকিত, তাহা হইলে নদী বহিত না; নদীর গতির কারণ মাধ্যাকর্ষণ বটে, কিন্তু পৃথিবী অসমতল না হইলে মাধ্যাকর্ষণ জলরাশিকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া আনিত ? উষ্ণতার বৈষম্যই বায়ুর গতির কারণ। যদি সমস্ত বায়ু সমান গরম হইত তাহা হইলে বায়ু বহিত না। বায়ুর কোন একস্থান অধিক উষ্ণ হইলে, তাহা লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানে চতুষ্পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিতে থাকে; এইরূপে বায়ু বহে। জলের উষ্ণতার বৈষম্যই সমুদ্রের স্রোতের প্রধান কারণ। সমস্ত সমুদ্রের জল যদি সমান গরম হইত তাহা হইলে জলাশয়ের ন্যায় সমুদ্র নিশ্চল থাকিত। সমুদ্রে স্রোত বহিত না। ঔপসাগরিক স্রোত (Gulf stream) দ্বারাই ইংলণ্ড মনুষ্যের বাসোপযোগী

হইয়াছে। যদি ঔপসাগরিক স্রোত হইতে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র উষ্ণজল না পাইত তাহা হইলে ইংলণ্ড প্রায় মেরুসন্নিহিত দেশের মত শীত প্রধান হইত। (১) পৃথিবীর কটি সন্নিহিত প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের উত্তাপ বেশী, এ জন্য সেখানকার জল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিতে থাকে; এবং সেই বাষ্পে পরিণত জলরাশির স্থান গ্রহণ করিবার জন্য মেরুর নিকটস্থ শীতল জলের স্রোত বহিতে থাকে। এক কথায় বলিতে এই, জগতে যদি উষ্ণতার বৈষম্য না থাকিত তাহা হইলে জগতের সমস্ত জীবন-রক্ষণ-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। অথচ উষ্ণতার একটি বিশেষ গুণ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে চতুষ্পার্শ্বে সমান ভাবে বিস্তৃত হইবার দিকে ইহার প্রবণতা। কোন স্থানে কোন একটা অত্যন্ত উষ্ণ বস্তু রাখিলে ক্রমে তাহার উষ্ণতা চারিপাশে সমান্ ভাবে

---

১ ব্যারণ দে লেসেপ যে পানামার যোজকে খাল কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এক খানি আমেরিকা-দেশীয় সংবাদ পত্র তাহাতে একটি গূঢ় অভিসন্ধি দেখিয়া বলেন যে, ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংলণ্ডের অনিষ্ট সাধনের জন্যই এ প্রস্তাব। পানামার খাল কাটা হইলে ইংলণ্ডের জীবন রক্ষক ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত এই নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া ইংলণ্ডকে বাসের অযোগ্য করিবে। ইহা বোধ করি, কবি রামদাস শর্ম্মার ভারত-উদ্ধারের পাশ্চাত্য সংস্করণ।

বিস্তৃত হইতে থাকে। একটা গরম ও একটা শীতল বস্তু এক সঙ্গে রাখিলে কিছুক্ষণ পরে উভয়েরই উষ্ণতা সমান হয়, শীতল বস্তু যতটা উষ্ণতা পায়, উষ্ণ বস্তু ততটা হারায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা আয়ব্যয়ের নিয়ম (Law of Exchange) বলেন। এবং সকল প্রকার তেজই (Energy) ক্রমে উষ্ণতায় পরিণত হইবার দিকে উন্মুখ। কাজে কাজেই মনে হয় যে, এমন এক সময় আসিবে যখন সকল প্রকার তেজই উষ্ণতায় পরিণত হইয়া জগৎময় সমভাবে বিস্তৃত হইবে। সে অবস্থায় পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় মৃত দশা হইবে।

উপরোক্ত রূপ মৃত্যু ছাড়া গ্রহের আর এক রূপ মৃত্যু আছে তাহাকে প্রলয় কহা যায়।

প্রলয়ে গ্রহের মৃতদেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। আমরা জীবন, মৃত্যু কাহাকে বলে দেখিয়াছি; এখন, প্রলয় কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে।

সৌর পরিবারভুক্ত পৃথিবীতে বলিয়া আসা হইয়াছে দুই শক্তির কার্য্যফলে গ্রহগণ স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত না হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। প্রথম, সূর্য্যের নিজাভিমুখে আকর্ষণ অথবা কেন্দ্রানুগ শক্তি, (Centripetal force)। দ্বিতীয়, সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া গ্রহের সরল রেখা পথে পলায়নের চেষ্টা অথবা তাহার কেন্দ্রা-

ত্তিগ শক্তি (Centrifugal force)। যদি কখনও কোন জ্যোতিষ্কের এমন অবস্থা হয় যে তাহার কেন্দ্রাত্তিগ শক্তি অতীব অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব বৃদ্ধিহেতু সেই জ্যোতিষ্ক ক্রমে সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে এবং তাহার প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এইরূপ সূর্য্যের গ্রাসে পতিত হওয়াকেই গ্রহের প্রলয় বলা যাইতে পারে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একটা জ্যোতিষ্কের জীবন রক্ষণের প্রধান কারণ তাহার গতি; কাজেই পৃথিবীর মৃত্যু চিন্তা করিতে গেলে তাহার গতির বিষয় আলোচনা আবশ্যক। যদি আবহমান কালের মধ্যে পৃথিবীর গতির কোন বৈলক্ষণ্য না দেখা গিয়া থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর পরিণামের বিষয় এ সূত্র হইতে কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। কিন্তু বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর গতির কিছু লাঘব হইয়াছে। যদিও ইহার মাত্রা চুলের মত বই নয়, তথাপি ইহা হইতে পৃথিবীর গতিহ্রাস সপ্রমাণ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল অপেক্ষা চন্দ্রের গতি এখন কিছু বৃদ্ধিশীল বলিয়া হঠাৎ মনে হয়। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে Secular acceleration of the Moon's mean motion বলে। কিন্তু চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হওয়া অতিশয় অসম্ভব

বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন চন্দ্রের গতি আসলে বাড়ে নাই, পৃথিবীর গতি হ্রাস হেতু চন্দ্রের গতি বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন চন্দ্রের গতিবৃদ্ধির কোন কারণই তাঁহারা দেখেন নাই। গতি বৃদ্ধির অর্থই কার্য্যের বৃদ্ধি, ও শক্তি না হইলে কার্য্য হইতে পারে না—অতএব চন্দ্রের গতি বৃদ্ধির অর্থই এক নূতন শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু কোথা হইতে এ নূতন শক্তির আবির্ভাব হইবে? জগতের শক্তি-সমষ্টির কখনও ক্ষয় বৃদ্ধি হইতে পারে না; ইহা জগতে চিরকাল সমান আছে ও থাকিবে, শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র। এরূপ না হইলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী নিত্য সমান ভাবে রক্ষিত হইত না, তাহাতে বৈলক্ষণ্য হইত। প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতার (Uniformity of Natural Laws) উপরেই সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র অবস্থিত। এবং যেহেতু চন্দ্রের গতি-বৃদ্ধির কোন কারণ দেখা যায় না, অতএব ইহা নিশ্চয় যে, চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হয় নাই। তবে গতি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর গতি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ মনে হয়। কিন্তু এই রূপ কেবল একটা অনুমান কথন কোন একটা মতের ভিত্তি হইতে পারে না। পৃথিবীর গতি হ্রাস করিতে প্রত্যক্ষ পক্ষে যত্নশীল কোন বিশেষ কারণ দেখিতে না পাইলে আমরা উপরি উক্ত যুক্তিকে নিতান্ত আনুমানিক বলিয়া অবহেলা করিতে পারিতাম;

কিন্তু ঐরূপ একটি প্রত্যক্ষ কারণ বৈজ্ঞানিকেরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন।

সমুদ্রের জলের এক প্রকার গতি আছে যাহাকে আমরা জোয়ার ভাঁটা বলি। এই জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর গতি অপহরণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশে যত্নশীল। পৃথিবীর স্থলীয় ও জলীয় অংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের বৈষম্যই (Differential attraction) এই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ। সূর্য্য এত দূরে অবস্থিত যে তাহার জল ও স্থলের উপর প্রায় সমানই আকর্ষণ, তাহার বৈষম্য অতি কম; সেই জন্য সূর্য্যের সহিত জোয়ার ভাঁটার গৌণ সম্পর্ক। * চন্দ্র জলরাশিকে আকর্ষণ দ্বারা ফাঁপাইয়া তোলে,

* আকর্ষক ও আকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণের প্রভাব হ্রাস হয়, এবং তরল বস্তুর কোন এক অংশ অপর অংশ হইতে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু দৃঢ় বস্তুর সে রকম হয় না। এই কারণে কোন তরল বস্তু আকৃষ্ট হইলে, তাহার উপরিভাগেই আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া সে তরল বস্তুকে সহজে স্ফীত করে, এবং দৃঢ় বস্তু আকৃষ্ট হইলে তাহার কেন্দ্রে আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তাহার সমুদায় অংশকে এক সময়ে সমানভাবে (as a whole) আকর্ষণ করে। কিন্তু জলের উপরিভাগ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৪০০০ মাইল বলিয়া জল অপেক্ষা স্থল ভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব কম হয়, সেই জন্য স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক স্ফীত হইয়া উঠে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব এত অধিক

কিন্তু কোথা হইতে সে জলরাশির পার্শ্বগামী গতি হয়? চন্দ্র ত আর তাহাকে অন্য কোন দিকে গতি দিতে পারে না, এবং বাহিরের কোথা হইতেও গতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এ গতি কোথা হইতে আসে?

চন্দ্র কর্ত্তৃক উন্নমিত এই জলরাশি পৃথিবীর ঘুরিবার সময় তাহার কঠিন স্থল অংশের সহিত ঘর্ষণে সেই স্থলভাগের গতি লইয়া গতি পায়।—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখানো যাউক।

একটি গোলা চালাইয়া একটি স্থির গোলাকে আঘাত করিলে যেমন সেই গমনশীল গোলার শক্তি পাইয়া স্থির গোলাটি চলিতে থাকে তেমনি পৃথিবীর ঘূর্ণমান কঠিন অংশের আঘাতে গতি পাইয়া জলরাশি চলিতে থাকে। পৃথিবী যে জলকে এইরূপ গতি দেয়, পৃথিবী এ শক্তি কোথা হইতে পায়? সে ত আর অন্য কোন স্থান হইতে নূতন শক্তি পাইয়া জলকে চালাইতে পারে না, নিজের

যে তাহার তুলনায় ৪০০০ মাইল কিছুই নহে, কাজেই জল স্থলের উপর সূর্য্যের আকর্ষণের বৈষম্য অতি অল্প। সেই জন্য বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি চন্দ্রের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাতে চন্দ্রের আকর্ষণের মত জলকে স্ফীত করিতে পারে না। চন্দ্র অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া ৪০০০ মাইলেই তাহার আকর্ষণের অনেক তারতম্য হয়।

গতিশক্তিরই অংশ দিয়া জলকে চালায়। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপে পৃথিবীর গতি-শক্তির কিছু লাঘব হয়। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে উল্লিখিত গোলার মধ্যে যদি দুইটিরই সমান ভার ও আয়তন হয়, তাহা হইলে স্থির গোলাকে চালাইতে গিয়া গমনশীল গোলা শীঘ্রই থামিয়া যায় এবং তাহার গতি পাইয়া স্থির গোলা চলিতে থাকে। যদি পৃথিবীর স্থলীয় অংশ ও তাহার সহিত যে জল রাশির ঘর্ষণ হয়, এ দুয়ের ভার সমান হইত তাহা হইলে পৃথিবীর গতিও থামিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। সমান নহে বলিয়াই তাহার গতির কেবল অল্প মাত্র বেগহ্রাস হয়। এবিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। এক খণ্ড প্রস্তর কোন দ্রুতগামী চাকার গাত্রস্পর্শ করিলে সেই চাকার গতি পাইয়া প্রস্তর খণ্ড দূরে চলিয়া যায়, কিন্তু এই কার্য্যে যতটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহা চাকার গতির হিসাবে খরচ পড়ে। উহাতে দ্রুতগামী চাকার কিছু বেগ কমিয়া যায়। সেই রূপ দেখা যায়, পৃথিবীর গতিশক্তি পূর্ব্বোক্ত কারণে কিছু কমিয়া গিয়াছে। এখন, নিজের চারিদিকে ঘুরিতে পৃথিবীর পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সময় লাগে, কাজে কাজেই সূর্য্য-প্রদক্ষিণ সময়ের দৈর্ঘ্য এখন কিছু বাড়িয়াছে। এই জন্যই চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক দিবসে চন্দ্র ঘুরিতেছে মনে হয়।

ইহা ব্যতীত পৃথিবীর গতি-লাঘব হইবার আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্থির হইয়াছে যে আকাশের এমন কোন স্থানই নাই যেখানে ঈথর (Ether) না আছে। যদিও ঈথর এত সূক্ষ্ম যে উহা মাধ্যাকর্ষণের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া কল্পিত হয়, তথাপি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঈথরের সহিত ঘর্ষণেও শক্তির হানি হয়; এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, এনকি দ্বারা আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতুর কক্ষ ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ক্রমশই ঐ ধূমকেতুর কেন্দ্রাতিগ গতি কমিয়া যাইতেছে। ইহার অন্য কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজেকাজেই বৈজ্ঞানিকেরা ঐরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি একটী জ্যোতিষ্ক ঈথর ঘর্ষণে শ্লথগতি হইতে পারে তবে অন্যান্য জ্যোতিষ্কই বা কেন সেরূপ না হইবে? এই কারণ হইতে যদিও অতি অল্পই ফল হইবার সম্ভাবনা তথাপি ইহাও পৃথিবীর মৃত্যুর অন্য কারণের সহায়তা করিতে পারে।

এইত দেখিতে পাওয়া গেল পৃথিবীর গতি কমিবার দিকে উন্মুখ। এই কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিলে কালে যে পৃথিবী সূর্য্যে মিশাইয়া যাইবে—ইহাই সম্ভাব্য। বলিবার আবশ্যক নাই এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই পৃথিবীতে আর জীবের বসতি থাকিবে না, পৃথিবী চন্দ্রের মত হইয়া পড়িবে।

ইহা ছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে সঙ্কোচন নিয়মকে সূর্য্যের সম-পরিমাণ উত্তাপ রক্ষার কারণ মনে করেন, যাহা "পৃথিবীর উৎপত্তি" অধ্যায়ে বলিয়া আসা হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে সূর্য্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। সমপরিমাণে উত্তাপ দিবার নিমিত্ত সূর্য্যের তাহা হইলে প্রত্যেক শতাব্দীতে দুই যোজন করিয়া সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া এইরূপ উত্তাপ বিকিরণ ও সঙ্কোচন দ্বারা পরিমিতায়তন সূর্য্য কি কালে শীতল হইয়া যাইবে না ?

উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যাভ্যন্তর বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল বা কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা এখনো অপরিজ্ঞাত, সেই জন্য কতদিন সূর্য্যের উত্তাপ এইরূপ সমভাবে থাকিবে তাহা নিশ্চয় গণনা করা যায় না। তবে উত্তাপ রক্ষার জন্য সূর্য্যের যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক সেই সঙ্কোচন-পরিমাণ গণনার দ্বারা স্থূলতঃ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে আর ৫০ লক্ষ বৎসরে সূর্য্য আয়তনে এখনকার অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে এবং সূর্য্যের অভ্যন্তরদেশ যদি এখনো কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ তখন কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উত্তাপ হারাইতে থাকিবে। এই নিয়মের বশে চলিলে সর্ব্বশুদ্ধ আর ১০০ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্তও সূর্য্য জীবন রক্ষার উপযোগী উত্তাপ দিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে পৃথিবীর বিনাশ এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া সহকারে এত অধিক বৈজ্ঞানিক মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে সে বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। এখন উপরে সন্নিবেশিত মত গুলি যে কালে পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইবে না—ইহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? যাহাই হউক মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে শেষে মঙ্গল হইবেই।

OPINION OF THE PRESS.

দীপ-নির্ব্বাণ।

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

CALCUTTA REVIEW.

"দীপ-নির্ব্বাণ নামে একখানি অভিনব নভেল্ আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এ খানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশুনা, এরূপ রচনা, এরূপ সহৃদয়তা এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণী।

বসন্তোৎসব।

Basanta Utsab * * * has here and there passages of such intrinsic poetic beauty and natural worth that we have little doubt it will make its way to every lover of Bengali literature. The songs in pp, 8, 21, and 33, and especially the one in dedication, are truly poetic, and have an exquistely delicate touch. There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so throughly chaste and sweet, so rich in charms of Poetry, and, therefore, none so well calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, 'revolutionize the exsisting style of opera-writing in Bengali by giving it a healthy tone and moral vigour which it so much wants. As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a "bubble of visionary happiness" unruffled by the tempests blowing without. We cordially recommend it to the reading public, and sincerely congratulate the author on her very excelleet production. We shall be glad to see it in the hands of every reader of Bengali literature.

We hear the anthor is a lady of a very respectable Bengali family of Calcutta. 1t is customary

to make some relaxations of strict critical canons in favour of lady writers. We are not inclined to countenance such partiality, nor is there any necessity for it, in the present case. *Basanta Utsab* can stand upon its own merits.

INDIAN MIRROR.

This charming little work is, we understand, the production of a Bengali lady, otherwise known as the authoress of *Dip Nirban*. It has an immense interest for us. Written by a lady belonging to an illustrious family in Bengal, it shows, in the clearest manner possible, the many advantages to be derived from a superior order of mental training among females.

The number of operatic pieces in Bengali is small, much less the number of good and readable ones. But here we have a work containing a number of exquiste songs. The scenes are all well conceived. And we are of opinion that its production is a marked indication of a cultivated mind and refined taste, so rarely to be met with in the ordinary run of Bengali operas. We may venture to say *Basanta Utsab* is the *best of its kind* in the Bengali language. The song serving as dedi-

cation *Lila's* songs of despair and disappointed love, and those of *Sangit* and *Kabita* have a charming effect upon the reader. The third scence, Act I, which brings us to the temple of *Maya Debi* with *Udasini* absorbed in prayer is exqnisitely grand. And we can well conceive what a telling effect it will have on the audience if properly managed. From what we have said above we have no hesitation in asserting that *Basanta Utsab* is a work of intrinsic merit and that it differs widely from other works of its class in its superior moral tone and purity of sentiments and expressions. We heartily wish it may have an extensive circulation.

BRAHMO PUBLIC OPINION.

আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতি বিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যে সকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসীদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতিনাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। সখীদের ফুলতোলা, লীলার নৈরাশ্য, শোভার ভালবাসা, উদাসিনীর মন্ত্রতন্ত্র অতি

সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর গীতিনাট্য খানির উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছি।

নববিভাকর।

The writer of this small opera is a Bengali lady who is very favorably known to our readers as the authoress of Dip Nirvan a novel which has been noticed at considerable length in a previous number of this *Review.* The present work fully sustains the reputation of its writer. The subject of the opera is a well conceived story of two male and two female lovers, The story is told in an exquisite style. Tho authoress displays high poetical powers, and many of her descriptions are charming webs of fancy woven by a fine and subtle instinct of poetry.

This is indeed the best Bengali opera we have yet seen. Its writer is an honour to her sex and to her country.

CALCUTTA REVIEW, JANAURY 1881.

ছিন্ন-মুকুল।

Another good book is before us—*Chinna Mukul* a Novel by the authoress of *Dip Nirban* and *Basanta Utsob*, The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasant trsnsition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princes of *Dip Nirban*. *A* deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic seenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gloom around. The dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of thsi writer, chaste, clear, sweet, and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost al of the characters are exteemely natural especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman-heroism and abnegation of self liberate the fancy

and gladden the heart. The character of Promod her selfish brother, has hardly, been less cleverly drawn. It is not difficult to find original of such character in this cold, calculating world. Niraja, the other femal charactor, thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignifican-ce in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that described the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all-absorbing love on the other, constitute an interesting reading, and are sure to give the book in which they occur a respectable place in Bengali fiction.

INDIAN MIRROR.

মালতী।

It is a sweet short story simply told. It is gratifying to see that the talented authoress does not allow her powers to remain idle.

গাথা।

This little book of poetical tales is a novelty in Bengali literature. and a novelty the charms of which challenge onr sincere admiration. The poetry is the poetry of genuine heart-felt pathos—powerful from its sublimity and affecting from its tenderness. There is not a word or image in the *Gathas* to disturb the placid tenor of sacred melancholy that pervades it, nor an idea or conception to break our dream of soft communion with something holy and far removed from earth. Lest we should be deemed too rhetorical, we give below, a rather loose translation of a picture drawn by the writer of an unhappy girl—lost, in the reveries of her sorrow and pains * * *

Perhaps it would be needless to inform the reading public that the writer of the *Gatha* under review is the noted writer of *Dip Nirnan, Basanta Utsab, Malaty, and Chinna Mukul.* An honest historian of Bengali literature will find himself puzzled in doing justice to a fair writer who commencing her literary career with the *Dip Nirban* at an early age, could surprise the literary public with gifts that would live as long as that literature lives.—Sunday Mirror, Septemper 11, 1881.

The writer of this charming little book of poetical tales is Srimati Svarna Kumari Devi a daughter of our well-known fellow-townsman, the Venerable Babu Denendra nath Tagore. While yet in her teens she commenced four years ago her literary career with the Dip Nirvan. The works of the fair writer like those of the late lamented Miss Toru Dutt, possess, for obvious reasons, a peculiar interest, Miss Toru Dutt finisheed her education in Europe and wrote in foreign languages, while Srimati Svarna Kumari is and has always been an inmate of the zenana, and she writes in her mother-tongue. An educated Hindu woman's observations of men and things in general, embodied in a chaste and vigorous style can hardly fail to arrest the attention of the student of literature and the social philospher.

The first production of Srimati Svarna Kumari Devi, Dip Nirvan, an historical romance, made its appearance in 1876 ; and it is no exaggeration to say that the literary public was surprised with it. As the book, which possessed great merits, did not disclose the name of its writer, speculation was naturally rife as to is authorship. It became known in course of time that the accomplished writer was a young Hindu lady belonging to one of the highest families in the metropolis. The

Dip Nirvan, as might have been expected called forth warm encomiums from literary critics and the Bengali reading public. It displyed such beautiful conception and skilful delineation of characters, such depth and purity of thought and such chasteness and eloquence of style, that the public was forced to the conclusion, that the writer was possessed of high talents. The calcutta Reviewer felt no hesitation in prononucing Dip Nirban "to be by far the best book that has yet been written by a Bengali lady" and in calling 'it one of the ablest in the whole literature of Bengal." It is needless to add that the work gave promise of great future excellence, Srimati Svarna Kvmari Devi's two next books "Basanta Utsav" or the Spring Festival, a melodrama and "Chhinna Mukul" or the Broken Blossom, a novel, followed each other in quick succession. Basanta Utsav contains many passages of intrinsic poetic beauty and many sweet songs, which testify to the writer's powers as a poet and a musical composer. She has evidently inherited a large shaie of the superior musical talents of her family, which has the honour of claiming Raja Sourindra Mohun Tagore as one of its ornaments. Chhinna Mukul, which is a tale of our own days comes quite up to the mark, and fully supports the

previous reputation of the writer. She then produced Malati an excellent novel, in which within a short compass, are vividly portrayed some of the subtlest workings of the heart.

Srimati Svarna Kumari Devi's last published work is Gatha, which is now before us. It is a collection of four beautiful idylls and as such, a nevelty in Bengali literatnre. Its poetry, as a contemporary justly remarks "is the poetry of genuine heart. felt pathos—powerful from its sublimity and affecting from its tenderness," and its versification is delicate and sweet." It is difficult to single out any one passage when so many challenge our admiration. But the best piece in the book is certainly that with which it concludes. The story on which this truly pathetic piece is based is very simple. A young man leaving behind his beloved and charming wife goes to a distant foreign country to fight the battle of life, He achieves success and sets out for home. He, however, enceunters the grave perils of a shipwreck on the return journey, and reaches his destination just in time to clasp in his agonised bosom the almost lifeless from of his wife. The feelings and situation of the unfortunate wife are beautifully conceived and skilfuly delineated.

The richness of imagination with which the

picture of the final catastrophe is drawn cannot be sufficiently admired, and reminds us of some of Byron's vigorous touches.

It is customary to make some relaxation of strict critical canons in favour of lady writers. But there is no necessity for extending this indulgence of the productions of Srimati Svarna Kumari Devi * * *

The works of Srimati Svarna Kumari Ghosal show clearly that she is well read in both English and Sanskrit poetry as well as in European works of imagination ; and we perfectly agree with the Calcutta Correspendent of the *Hindu* of Madras, an extract from whose letter we published in these columns some little while ago, "that never before in Bengal did a lady writer of such real powers and abilties appear, and shed snch a lnstre on the literature of her country" as the talented artheress of Dip Nirvan Basanta Utsav, Chinna Mukul, Malati and Gatha.

HINDOO PATRIOT.

To readers of this Review, the writer of this work is already favorably known as the authoress of a good Bengali novel, entitled *Dipnirvan*. and of a good Bengali opera entitled *Basanta Utsav.*

The work before us consists of four small love stories in verse. The stories, we must say, are all happily conceived, indicating a refined and cultivated taste, a poetical frame of mind, and a sweet, tender, and some times even vigorous, fancy. The stories are told in a half lyrical, half narrative style, of which the fair writer seems to be a perfect master. Her versification is sweet, smooth, musical and eloquent. She appeals strongly to her reader's feelings. She describes the minds of lovers with great skill, and she has also a fine pencil for external objects.

Calcutta Review.

১। "দীপনির্ব্বাণরচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মালতী, ছিন্ন-মুকুল, বসন্ত উৎসব, গাথা ও দীপ-নির্ব্বাণ।"

বঙ্গের চিরভূষণ-স্বরূপা দীপনির্ব্বাণরচয়িত্রীর উচ্চশ্রেণীস্থ কাব্যোপন্যাসসমূহ বালিকা কুসুমকুমারীর কুসুমিকার সহিত এস্থলে একত্র স্থাপিত ও একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। দীপ-নির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল ও গাথা প্রভৃতি গ্রন্থ এভাবে এবং এইরূপে সমালোচিত হইতে পারে না। আমরা যদি কখনও হিমেন্স, হানামোর, হেরিয়েট মার্টিনিয়ু এবং মেরায়া এজওয়ার্থ প্রভৃতি বৃটিশললনাদিগের কবিত্ব ও লিপিনৈপুণ্যের সমালোচনা করিতে অবসর পাই, তাহা হইলে তুলনায় সমা-

লোচনা করিয়া তখন আমরা এই চিরস্মরণীয় বঙ্গললনার কবিত্ব ও চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় দিব। ইহাঁর সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ইহাঁর পুষ্পময়ী লেখনীর উপর ভারতীর পুষ্পবৃষ্টি হউক, এবং বঙ্গের যে সকল শিক্ষানুরাগিণী কুলকামিনী লেখা পড়া শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার ইহাঁর গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। পড়িলে অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগের ও আমাদিগের উপকার হইতে পারে।

বান্ধব, পৌষ ১২৮৮।